প্রথম প্রকাশ—৯ শ্রাবণ, ১৩৬৭

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
বিভূতিভূষণ রায়
বিদ্যাসাগর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১৩৫-এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
রবীন দত্ত

শ্রীমতী কমলা ঘোষ

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল ঘোষ

পরমপ্রিয়েষু

প্রাগের একটি দিন

গল্পলেখক হয়ে বড্ড মুশকিল—যা-কিছু লিখি, আপনারা ধরে নেন কল্পনায় বানানো। অপরাধ আমাদেরই। শাস্ত্র বলেছে, মিথ্যে কথা এক-শ বার বলবে, কাগজে-কলমে লিখবে না কদাচ। কিন্তু গল্পলেখকরা এমন, মিথ্যেকথা লেখে—লিখে ছাপিয়ে হাজার জনের চোখের সামনে মেলে ধরে। এ হেন বেপরোয়া মিথ্যুকদের কে বিশ্বাস করবে?

কিন্তু যথাধর্ম সত্যঘটনা লিখছি আজ একটা। ভাগ্যক্রমে জবর একটি সাক্ষি আছেন। এই কলকাতা শহরেই আছেন। আমার কথা না মানেন, তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন। শ্রীযুক্ত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। কথাশিল্পী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র তিনি, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের নাতি। নিজেও জাঁদরেল লেখক, রীতিমতো গুণীজ্ঞানী। এহেন ভদ্রলোক মিথ্যে সাক্ষি দেবেন না, নিঃসংশয়ে ধরে নিতে পারেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ শহরে একদিনের ব্যাপার।

চেক লেখক-সমিতির দাওয়াত নিয়ে গেছি সেখানে। মস্তবড় হোটেল, রাজকীয় মেজাজে আছি। ক্রুসবা হোটেল—ক্রুসবা কথাটার মানে হল শান্তি।

মোহনলালের শ্বশুরালয় চেকোশ্লোভাকিয়ায়—চেকনন্দিনী শ্রীমতী মিলাডা তাঁর সহধর্মিণী। মোহনলাল সেই সময়টা সপরিবারে প্রাগে আছেন। একটা নার্সারি-ইস্কুল দেখবার জন্য শ্রীমতী আমায় নিমন্ত্রণ করলেন। কথা হল, সকালবেলা মোহনলাল আমার হোটেলে আসবেন—দু-জনে একসঙ্গে বেরুব।

প্রাতরাশ সেরে ট্রামে চেপে বসা গেল। মোহনলালকে বলি, কোনখানে যাচ্ছি—পথঘাট বুঝে এসেছেন তো?

মোহনলাল বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়। চোখ বুজেও যাওয়া যাবে।

আমাদের এসপ্লানেডের মতন একটা জায়গা—নানা রাস্তা নানা দিকে বেরিয়ে গেছে—সেইখানে নামতে হল। নেমে পায়ে-হাঁটা বেশ খানিকটা। কিন্তু উত্তরে না দক্ষিণে—কোন দিকে হাঁটি? মোহনলাল জেনেবুঝে এসেছিলেন ভাল করেই, কিন্তু ভূমিতলে পা দিয়েই সব গুলিয়ে গেছে। কোন রাস্তায় সে ইস্কুল, তা-ও বিস্মরণ হয়ে গেছে। আমি মূর্খস্য মূর্খ—যৎকিঞ্চিৎ ইংরেজি মাত্র সম্বল। সে ভাষা এখানকার রাস্তায় কোন্ কাজে লাগবে? অতএব চিত্রার্পিতবৎ একদিকে দাঁড়িয়ে আছি। শ্বশুরবাড়ির কল্যাণে মোহনলাল চেকভাষা ভাল বলেন। তিনি একে তাকে প্রশ্ন করে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগলেন।

কেউ কিছু বলতে পারে না। পথের ধারে টেলিফোন-বাক্স। বাক্সের খোপে পয়সা গুঁজে দিয়ে ফোনও করলেন যেন কাকে। সময় হয়ে গেল, তাঁরা সব অপেক্ষা করছেন। ছি-ছি, ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ কী মনে করবেন আমাদের সম্পর্কে? অধৈর্য হয়ে উঠেছি—

হেনকালে দেখি, পরিচ্ছন্ন-বেশভূষা এক বুড়িমানুষ স্তিমিত দৃষ্টি স্থাপন করেছেন আমার দিকে। পুঁথি পড়ার মতন করে কি পড়ছেন। তারপর দ্রুতপদে কাছে চলে এলেন। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, তুমি কি ইণ্ডিয়ার মানুষ?

ইয়োরোপ ঘুরে আসবার পর বন্ধুজনে অনেকে প্রশ্ন করেছেন, কি রকম অবস্থা এখন বলো—গাত্রবর্ণ নিয়ে ব্যবহারের ইতরবিশেষ হয় কোন রকম?

হয় বই কি! এই তার দৃষ্টান্ত দেখুন। ইণ্ডিয়ার মানুষ

মোহনলালও বটেন। কিন্তু রং ফর্শা হওয়ায় তাঁকে পুঁছল না, অকৃত্রিম কৃষ্ণবর্ণ প্রসাদাৎ খাতির আমাকেই শুধু। আমার কাছে এসে বৃদ্ধা মহিলা ভাব জমাচ্ছেন: ভারত থেকে আসছ বুঝি?

এমনি ধরনের অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে। আর ডরাইনে, রঙের ঘোর লেগেছে ওঁর চোখে। সগর্বে ঘাড় নাড়ি: হাঁ--

দেখ, অনেককাল আগে এক ভারতীয় কবি এসেছিলেন এই প্রাগে। টেগোর। দীর্ঘদেহ, জ্যোতিষ্মান চেহারা, তুষারশুভ্র দাড়ি—

তখন আর রক্ষা আছে! বুকে থাবা দিয়ে বলি, ভারতীয় আমি তো বটেই। তদুপরি বাঙালি—টেগোরের সমজাতি। টেগোর ছিলেন কলকাতার বাসিন্দা, আমারও বাস সেই কলকাতায়।

টেগোর কবিতা পড়তেন। বাঁশির মতো মধুর কণ্ঠস্বর। সেই ভাষা বুঝি নে, কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর লাগত।

দেমাক আরও এক পর্দায় চড়িয়ে বলি, সেই যে আশ্চর্য সুন্দর ভাষা—তার নাম বাংলা। লেখক আমিও—সেই বাংলাভাষারই লেখক আমি।

মহিলা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আমায় নিরীক্ষণ করছেন। গণ্ডদেশে তুষারশুভ্র দাড়ি খুঁজছেন কিনা বলতে পারিনে। দেবকান্তি এবং দাড়ির অভাবে টেগোর অপেক্ষা খাটো ভেবেছেন ঠিকই— কিন্তু দু-চার ইঞ্চির অধিক নয়, খাতির দেখে সেই রকম মালুম হল। মোহনলাল ইতিমধ্যে কাছে এসে পড়লেন। তাঁর পরিচয়টাও দিয়ে দিই: টেগোরের বাড়িতে তাঁরই সান্নিধ্যে আবাল্য ইনি মানুষ। লেখক ইনিও।

আর কি, প্রাগের রাস্তার উপর নিতান্তই আপন-মানুষ আমরা এই তিন জন। কতকাল আগে তিনি কবির পরিচর্যা করেছিলেন—আমাদেরও চেনাজানা যেন সেই সময় থেকে। স্বল্প ইংরেজি নিয়ে তড়বড় করে কত কি গল্প!—তখন বয়স কম,

তরুণী বলা চলে। আমার স্বামী আর আমার উপর ভার ছিল টেগোরের দেখাশুনো করবার। সে এক বিচিত্র স্মৃতি। কত বছর কেটে গেছে, বয়সে বুড়িয়েছি, মহাসমর ইয়োরোপ এবং আমাদের দেশের উপরে বয়ে গিয়ে সমস্ত ওলটপালট করে দিল। কিন্তু টেগোরের সাহচর্যের সেই দিনগুলো আজও মনের মধ্যে তাজা হয়ে আছে।

ঠাসা আলাপনের ভিতরে একটুকু ফাঁক করে নিয়ে বলি, সবই তো হল মা-জননী। কিন্তু আমরা এক জায়গায় যাবার জন্য বেরিয়েছি—অমুক ইস্কুলে। কিছু তার হদিস দিতে পার?

বাঁচা গেল, জায়গাটা জানা আছে মহিলার। বললেন, সে তো বেশ-খানিকটা দূর—

পথটা ভাল করে বাতলে দাও।

বৃদ্ধা ঘাড় নাড়লেন: সে হয় না। পথ ভুল করবে হয়তো। আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

হেসে বললেন, খানিকটা বেশি সঙ্গ পাব, আরও খানিকক্ষণ কথা বলা যাবে টেগোরের মানুষদের সঙ্গে।

ইয়োরোপে গরমটা সেবার* প্রখর। বিষম চড়া রোদ। গল্প করতে করতে নিয়ে চললেন তিনি আমাদের। আমি আবার এক কাজ করেছি—ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বেরিয়েছি রাস্তায়। নিচে অবশ্য গরম কাপড়। সাত-সমুদ্দুর তের-নদীর পার থেকে ধুতি বয়ে এনেছি—কোনো দিন পরতে দেবে না, ঠাণ্ডা লেগে যাবে বলে ভয় দেখায়। আজকে বেরোবার মুখে টের পায় নি ওরা কেউ। প্রাগের রাস্তা দিয়ে আজব পোশাক পরে একটা মানুষ হেঁটে চলেছে—বুঝুন। ভদ্রতা বজায় রেখে পথিকজন আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। শহরের এই তল্লাটে একটা চাপা আলোড়ন উঠেছিল—ক'দিন পরে ক্রাসার কথায় টের পাওয়া

* জুন ১৯৫৭

গেল: কী কাণ্ড করেছিলে তুমি! খবরের-কাগজে উঠবার মতো ব্যাপার—

চলেছি তো চলেইছি। আমাদের কষ্ট হচ্ছে, বৃদ্ধার দৃক্‌পাত নেই। টেগোরের গল্পে মশগুল। ইস্কুলের সমেনে এসে পড়েছি। দেরি হয়ে গেছে, উদ্বিগ্ন শিক্ষিকারা গেটের উপরে এসে প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু বৃদ্ধা ছাড়বেন না, তাঁর কথা শেষ হয় না। শেষটা একরকম জোর করেই ইতি টেনে বিদায় নিলাম। রৌদ্রতপ্ত দীর্ঘ পথ একা তিনি ফিরে চললেন। আর কখনো দেখা হবে না। ভুল হয়ে গেল—তাঁর নাম-ঠিকানাও নেওয়া হয় নি।

মজা আর একটু আছে, সেটাও বলি। রাস্তায়-হাঁটা জুতো নিয়ে বাচ্চাদের কাছে যেতে দেয় না—ধূলো-ময়লার কথা বাদ দিলেও জুতোর তলায় রোগ-বীজাণু লেপটে থাকতে পারে। মোহনলাল হোটেলে বলেছিলেন সে কথা। আমার সঙ্গে একজোড়া বিদ্যাসাগরি-চটি ছিল—মাথা-বাঁকানো লাল রঙের পুরানো জিনিস। কাগজে জড়িয়ে চটিজোড়া নিয়ে গিয়েছি। অফিস-ঘরে সু খুলে রেখে চটি-পায়ে হলের মধ্যে বাচ্চাদের সভায় গেলাম। আলাপ-পরিচয় এবং যথারীতি বক্তৃতাদি হল।

সেই দুপুরে নিমন্ত্রণ আছে এক জায়গায়। ইস্কুল থেকে সোজা সেখানে চলে যাব, হোটেলে ফিরব না। জুতো একজোড়া পায়ে পরে, আর একজোড়া হাতে নিয়ে নিমন্ত্রণ-বাড়ি কেমন করে যাওয়া চলে? চটি অতএব ইস্কুলে রইল, ওঁরা হোটেলে পৌঁছে দেবেন।

কী কাণ্ড সেই চটিজুতো নিয়ে! ওদেশে থাকতে কিছু জানিনে, কলকাতায় ফিরে এসে মোহনলাল আমায় বললেন। আমি তো বেরিয়ে গেলাম—বিচিত্র চেহারার চটিজোড়া শিক্ষিকারা নেড়েচেড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন। মোহনলাল তখন চটি-সম্পর্কিত ইতিহাস বলে দিলেন—বিদ্যাসাগরমশায় এই ধরনের

চটি পরতেন, তালতলার দেশি মুচিরা বানাত। আর কোথায় যাবে! সেই চটি চলে গেল আবার হলঘরে, বাচ্চাদের ডাক পড়ল। টেবিলের উপরে তুলে ধরে সকলকে দেখানো হল, বিদ্যাসাগরের মহৎ জীবনের কিছু কিছু বলা হচ্ছে সেই সঙ্গে। চটির বাহার নিয়ে রীতিমত তারিপ চলছে। উৎসাহীদের হাতে হাতে ঘুরছে আমার পায়ের পুরানো চটি।

গল্প শুনে মোহনলালকে বলি, যান মশায়, আগে বলতে হয়! চটি তবে তো দান করে আসতাম ইস্কুলে। বিদ্যাসাগরের নাম জড়িত বলে শ্রদ্ধা ভরে ওঁরা আলমারিতে সাজিয়ে রাখতেন।

পোল্যাণ্ডের দূর-গাঁয়ে

প্রাগ এরোড্রোমে সকাল থেকে হা-পিত্যেশ বসে আছি। উড়ব। পোলিশ লেখক-সমিতিও দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু প্লেন মিলছে না। পোজনান (Poznan) বলে এক নাম-করা জায়গা পোল্যাণ্ডের ভিতরে—নেপোলিয়ানের সঙ্গে দুরন্ত লড়াই হয়েছিল যেখানে। সেকালের সেই রণক্ষেত্রে ফি-বছর জাঁক করে মেলা বসে। ভুবন-জোড়া নাম। মেলার বাবদ অগুণতি মানুষ আর মালপত্রের চলাচল। যত প্লেন মেলাক্ষেত্রে ক্ষেপের পর ক্ষেপ দিচ্ছে, তবু সামাল দিতে পারে না। আমরা বসেই আছি।

ভোরবেলা নাকে-মুখে চাট্টি গুঁজে এসেছি। আবার কিছু হলে মন্দ হয় না। এরোড্রোমে ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু টাকা? ফেল কড়ি মাখ তেল—সেই কড়ি-বস্তুরই নিতান্ত অভাব। ক্রোনিন চাই—চেকোশ্লোভাকিয়ার কড়ি ছিল কাল একপ্রহর রাত অবধি। দেদার খরচ করে শেষ করেছি। সীমানা পার হয়ে গিয়ে ক্রোনিন

হয়ে যাবে ছাপা-কাগজ মাত্র। সীমানা পার করতেও তো পারবেন না, কাস্টমস ক্যাঁক করে টুঁটি ধরবে। তখন কি জানি, এত বেলা অবধি এরোড্রোমে বসে অন্য লোকের খানাপিনা দেখতে হবে ?

অনেক বেলায় হুকুম হল, উঠে পড়ো প্লেনে এবার। মাইকা নামে এক তরুণী ক'দিনের গার্জেন হয়ে খুব মাতব্বরি করে নিয়েছে আমাদের উপর। বিদায় দিতে সে এই অবধি এসেছে, আছে বসে সকাল থেকে। যাই এবারে !

ব্যথা-ভরা চোখে মাইকা হাতে হাত ঠেকায়। আর বিদায়-বেলা সব জায়গার মানুষ যেমন বলে, যাবো একবার তোমাদের দেশে। প্লেনের গহ্বরে বসেও রুমাল নাড়ছি। বিদায় মাইকা ! অনেক ইতিহাস ও অলঙ্করণ-খচিত শহর প্রাগ—বিদায়, বিদায় !

পোজনান পথে পড়ে, সামান্য এক ঘণ্টার রাস্তা প্রাগ থেকে। প্লেন ভূঁয়ে নামল। মেলার মানুষ নামল কতক, মেলার ফেরত উঠল কিছু কিছু। কাস্টমসের বিষম কড়াকড়ি। মালপত্র প্লেনে রেখে এসেছি, একটু পরেই তো উঠছি আবার আকাশে। উঁহু, তা হবে না, সমস্ত নামিয়ে নিয়ে এসো। কড়া রোদ, পথও বেশ-খানিকটা। যাবতীয় মাল কাঁধে বয়ে এনে শ্যেন-চক্ষুগুলোর সকাশে হাজির কবানো হল। খোল সমস্ত—ফেলে ছড়িয়ে তন্নতন্ন করে দেখাও। হয়েছে—বেঁধেছেঁদে রেখে এসো আবার যথাস্থানে। এসে ভদ্রলোক হয়ে বসে থাক। সময় মতন ডাক পাবে।

এত সমস্ত ধকলে ক্ষিধে অতিরিক্ত রকম উগ্র হয়েছে। চোখে অন্ধকার দেখি। আমাদের মতন ওরা ইংরেজের তাঁবে থাকে নি—অতএব ইংরেজি বোঝে না প্রায় কেউ। একটি পোলিশ টাকাও (Zlotych) হাতে নেই। এলাকার মধ্যে সবে পা ঠেকিয়েছি—উড়ে এসে মুঠোয় পড়তে পারে না। জানি নিরর্থক, পেটের জ্বালায় তবু এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করছি।

দশ-বারো গণ্ডা ইংরেজি-শব্দ জানে—এমনি একজনকে পেয়ে গেলাম ভাগ্যবশে। এরোড্রোমের একটি মেয়ে। কষ্টেসৃষ্টে বোঝানো গেল: মারা যাই কন্থে, যা-হোক কিছু উপায় করো, নয়তো অতিথি-বধের পাতকিনী হবে।

হাসল সে। গতরে মোটাসোটা কিন্তু হাসিটা ভারি মিষ্টি। কী চমৎকার দেখায় যে তখন! সে কথাও বলা হল—ভুবন-ভোলানো ঐ হাসির কথা। একেবারে আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে মেয়েটা বলে, বোসো এখানে। দেখা যাক কি করতে পারি।

করতেই হবে কিছু। দোষ তোমাদের, প্লেন এত দেরিতে ছেড়েই বিপদ। নয় তো ওয়ারশ পৌঁছে এতক্ষণে ঠেসে লাঞ্চ খেতাম।

বোসো না—

ক্ষণ পরে পিছনের একটা ঘরে ডেকে নিয়ে গেল: পানীয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। কড়া, নরম—যে রকমের খুশি। খাবার হবে না।

ঐ যে অত রয়েছে।

টাকা লাগবে। কিন্তু সে তো নেই তোমাদের।

মালদার ব্যক্তিরা ফূর্তিসে লেগে পড়েছেন। আমার মুশকিল, কফির অধিক চলে না।—দাও তাই এক কাপ।

জিজ্ঞাসা করছে, বড় কাপ না ছোট?

খুব বড়। যদ্দূর বড় তোমাদের নিয়মে না আটকায়।

দূরের টেবিলে এক ভাগ্যবান নানা বস্তু সাজিয়ে নিয়ে বসেছেন। দেখছেন আমাদের তাকিয়ে তাকিয়ে। গায়ের এই কালো রংটায় খুব কাজ দেয় বাইরে। সজ্জাদ জহির আমাদের মধ্যে মোটামুটি ফরাসি জানেন। কম্যুনিস্ট-তন্ত্রের দেশ—তা হলেও খানদানি ফরাসি ভাষার খাতির সর্বত্র। দেখ তো জহির, লোকটা ভাল বলেই মনে হচ্ছে। কিছু ফরাসি ছেড়ে দেখ।

দু-এক কথার পরে ভদ্রলোক নোট বের করে দিলেন। সে

তো ভালই—নাম-ঠিকানা বলে দিন মশায়। পেটের ক্ষিধেয় ঋণ নিচ্ছি, যথাকালে শোধ করব। কোন্ ঠিকানায় ফেরত দেবো, লিখিয়ে দিন সেটা।

এই প্লেনে তিনিও ওয়ারশ যাচ্ছেন: টাকা মেরে দিয়ে এক্ষুনি নিশ্চয় ইণ্ডিয়ায় পালাচ্ছ না—প্লেনের ভিতর ফেরত দেবার কথা-টতা হবে।

বিকালবেলা ওয়ারশ'য় নামলাম। লেখক-সমিতির সেক্রেটারি এসেছেন। গুটি দুই-তিন লেখক এবং সংস্কৃতি-দপ্তরের মেয়ে একটি সঙ্গে।

আরে মশায়রা, বিপদ হয়েছে—ঠিক কোন্ তারিখে আসছেন, আগেভাগে জানান নি। সব ক'টা হোটেলে ছুটোছুটি করলাম, একসঙ্গে পাঁচটা মানুষের জায়গা কেউ দিতে পারে না। কি করি বলুন এখন। গাঁয়ে গিয়ে থাকতে হবে আপনাদের।

এক ব্যক্তি আমাদের মধ্যে বিশেষ করিতকর্মা। সুকৌশলে নিমন্ত্রণ জোটানোর ব্যাপারে তাঁর জুড়ি নেই। প্রয়াস অকারণ নয়। পরের পয়সায় উত্তম খানাপিনা তো বটেই—তা ছাড়া বইয়ের পাওনার তাগিদ, নতুন বই গছানো, গল্প সিনেমায় তোলার বন্দোবস্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। ভদ্রলোক হায়-হায় করে উঠলেন: গাঁয়ে থেকে কাজকর্ম কী হবে ছাই! কথাবার্তা কার সঙ্গে বলব?

তাঁরা মুখ চুণ করে বলেন, তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। বেশি নয়, শনিবারের দিন গ্রাম থেকে আপনাদের ফেরত নিয়ে আসব। কষ্ট করে থাকুন এই তিনটে দিন।

আমি বললাম, মাত্র তিন দিন? তিনটে দিনে গাঁ-অঞ্চলের কতটুকু দেখব? ক'টা মানুষের সঙ্গেই বা পরিচয় হবে?

জায়গাটা চল্লিশ মাইল ওয়ারশ থেকে। জান (Jan Zakrzewski) নামে এক আধা-লেখক আমাদের সঙ্গে থাকবে।. ভাল ইংরেজি জানে, চালাক-চতুর খুব। এক দোষ—বউ খুব নাম-করা অভিনেত্রী—বউয়ের নাম উঠলেই গদগদ হয়ে পড়ে।

এরোড্রোম থেকে শহরের এ-রাস্তা ও-রাস্তা হয়ে, ফাঁকায় গিয়ে পড়ি। শহর কোথা—শ্মশানক্ষেত্র চতুর্দিকে। ঘরবাড়ি পুড়েজ্বলে ভেঙেচুরে পড়ে রয়েছে। অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে ওঠে। লড়াই শেষ হয়ে যাওয়ার তেরো বছর পরেও এই। বার্লিন আর ড্রেসডেন ছাড়া এমন রাক্ষসে-খাওয়া শহর আর দেখিনি।

জান বলে, দু-দুবার মার খেলাম যে আমরা। চেকোশ্লোভাকিয়ার মতো মিটমাট করে নিইনি। সে আমাদের কুষ্ঠিতে নেই। হিসেব করে আখের গোছাতে জানিনে। পোল্যাণ্ডের চিরকালের ইতিহাস এই। লড়াইয়ের গোড়ায় হিটলারের মার খেলাম—পোল্যাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ল নাৎসিরা। আমরাও ছাড়িনি। গোটা দেশে দখল গেড়ে বসেছে—তখনো গেরিলা-লড়াই চলছে আমাদের। শেষ মুখটায় আবার রাশিয়ায় মার। নাৎসিদের বড় ঘাঁটি এখানে—বোমা মেরে মেরে রুশরা পয়মাল করছে। মরছি আমরা।

আঙুল তুলে দেখাচ্ছে: ঐ যে পোড়া-বাড়িটা—পাঁচ-শ গেরিলা আস্তানা নিয়েছিল ওখানে। টের পেয়ে নাৎসিরা ঘিরে ফেলল। লড়াই করে সব ক-জন মরল, একটি প্রাণীও বাঁচেনি।

গাড়ি রোখো। ফোটো তুলে নিই এই বাড়ির।

জান বলে, তা হলে তোমাকে সমস্ত শহরের ফোটো তুলে বেড়াতে হবে। সব বাড়ির ইতিহাস মোটামুটি এই। রাস্তার ড্রেনের নিচে লুকিয়ে থেকেও লোকে লড়াই করেছে।

শহর ছাড়িয়ে টানা-রাস্তা। পিচ-দেওয়া, কোথাও বা শুধুমাত্র পাথরের। ঝকঝকে দুটো নতুন গাড়ি—হু-হু করে ছুটেছে। দু-পাশে সীমাহীন সবুজ মাঠ—অল্প একটুকু রুক্ষ জমি কিম্বা একটা

উঁচু টিলাও দেখিনে কোনদিকে কোথাও। যেন আমার বাংলা দেশ—জলে আর ফসলে ভরা বাংলার পূর্ব-অঞ্চল। বাঁধাকপি অজস্র, কপি কেটে কেটে ডাঁই করছে। রাই-ক্ষেতে হলুদফুলের সমুদ্র। আলুক্ষেত। চাষীদের বাড়ি। গরুর পাল চরছে, কালোয়-সাদায় মেশানো রং। তামাটে গরুও দেখতে পাই দু-চারটে। ভেড়া বেঁধে রেখেছে, ঘাস খাচ্ছে। মোটরগাড়ির চাকা-লাগানো বালি-বোঝাই গাড়ি—ঘোড়ায় টানছে। সাহেব গাড়োয়ান—মাথায় ময়লা টুপি পরনে ছাই-রঙের পাৎলুন ও বোতাম-খোলা জামা—গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ক্ষেতে চাষ করছে ঘোড়ার লাঙলে, ঘাস বাছছে। কাজ করছে বেশির ভাগ মেয়েরা। মেম-চাষীরা মাথায় রঙিন স্কার্ফ বেঁধে গম কাটছে লাইনবন্দি হয়ে। ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে ক্বচিৎ বা এক-আধ জন। দেখছি, আর খাতায় টুকে টুকে যাচ্ছি।

মোটর ছুটেছে, সামনে পড়ন্ত সূর্য। বাড়িতে বাড়িতে ফুলের সমারোহ। বড় বড় লালফুলের তোড়া আমাদের মোটরের দিকে এগিয়ে ধরে চেঁচাচ্ছে একটা মেয়ে। তার পরে ঐ রকম আরও অনেককে দেখতে পাচ্ছি। মোটরের বড়লোক খদ্দের ভেবে 'ফুল নেবে' 'ফুল নেবে' করছে গাঁ-ঘরের ছেলে-মেয়েরা।

আঁকাবাঁকা এক গ্রাম-নদী পার হলাম। মূল-রাস্তা ছেড়ে ডাইনে মোড় নিয়ে নদীর গা ঘেঁসে ছুটেছি, ঘন-কালো জলের স্রোত বয়ে চলেছে দু-পাশের শেওলা ও ঝুপসি গাছপালার ভিতর দিয়ে। কতক্ষণ ধরে ছুটলাম এমনি। এক সময়ে পার হয়ে গেলাম ঐ নদী। ড্রাইভার একবর্ণ ইংরেজি জানে না। আকারে ইঙ্গিতে অনেক করে বুঝিয়ে নদীর নাম আবিষ্কার করা গেল—Zুরা। খড়ে-ছাওয়া কুটির দেখছি, দেয়াল ইটের। কিন্তু চাল ফুঁড়ে একটা করে চিমনি—তখনই মনে পড়ে যায়, বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

মাঠের ওপারে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে জোড়া-গির্জার চূড়া।

মালুম হচ্ছে, বর্ধিষ্ণু কোন গ্রাম। তাই বটে। গির্জার পাশ দিয়ে অনেক চাষীর বাড়ি ছাড়িয়ে চলেছি। মুরগি খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছে, বাচ্চারা প্রায়-আদুল গায়ে খেলা করছে রাস্তার পাশে। ঠিক আমাদেরই এক চাষীপাড়া—শীতের দেশ বলেই নেহাৎ উলঙ্গ হয়ে নেই।

অবশেষে পৌঁছে গেলাম। পুরানো বাগানবাড়ি। কম্পাউণ্ড অতি প্রকাণ্ড, কিন্তু বাড়িটা খুব বড় নয়। তবে বেধড়ক উঁচু। তেতলার চারটে ঘর দিয়েছে আমাদের। তেতলা বটে কিন্তু ছ-তলা হার মানিয়ে দেয়। উঠতে উঠতে দস্তুরমতো হাঁপ ধরে যায়। জিরিয়ে নিতে হয় মাঝে একবার দু-বার। সেকেলে ঘোরানো সিঁড়ি—কার্পেট বিছানো সিঁড়িতে। ঘরের মেঝে জুড়েও দামি কার্পেট। ফারসি হরফে কার্পেটের উপর লেখা রয়েছে—খোদ পারস্য থেকে এই বস্তুর আমদানি।

গ্রামটার নাম নাইবোরো (Nieborow)। তিন-শ বছর আগে এই বাড়ি বানানো। বানানো অন্য লোকের, শেষটা রোজবিলদের (Rodziwill) দখলে আসে। পোল্যাণ্ডে তখন রাজতন্ত্র—রাজার সামন্তবর্গের মধ্যে প্রিন্স রোজবিল খুব নামজাদা। এইখানে থাকতেন তিনি বেশির ভাগ সময়। বিস্তর রসালো গল্প চলে এঁর সম্বন্ধে। নেপোলিয়ান তখন ইয়োরোপ চষে বেড়াচ্ছেন, নিজে ইনি নেপোলিয়ানের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। বংশের শেষ পুরুষ শেষ রোজবিল এখনো বেঁচে। পঁচাত্তর বছরের থুত্থুড়ে বুড়োমানুষ,—ওয়ারশ'য় থাকেন।

বাড়ি না বলে রাজকাছারি বলা চলে। জায়গাজমি প্রজাপাটক চতুর্দিকে ছড়ানো। শুধু ফসলের জমি নয়, জঙ্গল রয়েছে। জঙ্গলের কাঠে বিস্তর আয়। জলা-জায়গায় মাছের চাষ। এই সবের দেখাশুনো ও আদায়-তহশিলের জন্যে বাগানবাড়ি পা তৈরি হল গাঁয়ের ভিতর। লোকজন পরিবৃত হয়ে ধুমধাড়াক্কায়

দিন কাটত। লড়াইয়ের সময় অবধি খাসা কেটেছে। এখন রোজবিলদের কিছুই নেই—ঘরবাড়ি জায়গাজমি সরকারের সম্পত্তি। চাষীদের একছটাক জমি ছিল না, জমিদারের জমিতে গায়ে খেটে মজুরি পেত। তারাই এখন জমির মালিক, খাজনা বাবদে সরকার উৎপন্নের কিছু অংশ নিয়ে নেয় শুধু। বাড়িটা হল সাংস্কৃতিক দপ্তরের অধীন। একতলার কতক আর পুরো দোতলাটা জুড়ে মিউজিয়াম। তেতলার ঘরগুলো লেখক ও শিল্পীদের জন্য। লেখকেরা গাঁয়ে এসে নিরিবিলি থাকুন দু-দশ দিন, বইটই লিখুন। শিল্পীরা স্কেচ করুন; ছবি আঁকুন। হয়েছেও তাই। ধুরন্ধর প্রিন্সের বাড়িতে লেখকমানুষ শিল্পীমানুষ এসে আস্তানা গাড়ে। পাকেচক্রে কয়েক হাজার মাইল দূরের আমরা ক'টিও তার মধ্যে এসে জুটেছি।

ন'টায় সন্ধ্যা। সে যখন হয় হবে, তাড়াতাড়ি নেই। ডিনার অর্থাৎ রাতের খানা নিয়মমাফিক চুকিয়ে নিয়েছি সাড়ে-সাতটার ভিতরে। খেয়েদেয়ে বাগানে বেড়াচ্ছি।

প্রকাণ্ড বাগানবাড়ির চতুর্দিকে বড় বড় ওকগাছ—সাধুভাষায় আপনারা আকাশচুম্বী বলবেন—কিন্তু এমন ঘনপত্র এবং এ-গাছের ডালে ও-গাছের ডালে এমন মেশামেশি যে আকাশ পানে মাথা বাড়িয়ে চুম্বন করছে না দাঁত খিঁচোচ্ছে, কোন কিছুই নজরে দেখবার জো নেই। তলায় ঘুরতে ঘুরতে নিজেদের অতিশয় নগণ্য মনে হয়। আবার কাঠের টবে বসানো একজোড়া বেঁটে কমলালেবুর গাছ পিছন-উঠানের উপর—চীনদেশ থেকে আমদানি —তিন শ' বছরে বাড়বৃদ্ধি হয়ে পুরো তিন হাতও হয়নি। লম্বা ঝিল—ঝিলের এধারে-ওধারে পায়ে-চলার পথ। সেই পথে যেতে যেতে বিলের ধারে এসে পড়া গেল। আমার গাঁয়ের বাড়ির পুকুর-বাগান ছাড়িয়ে বিল আছে যে রকম। সে-বিল এর চেয়ে

অনেক বড়। হায়রে হায়, কোন দিন আর চোখে দেখতে পাব কিনা জানিনে। পাকিস্তানে পড়ে গেছে।

কাঁচা-পাকা চুল প্রবীণ এক নাট্যকার আমাদের মধ্যে এসে জুটলেন। বেড়াচ্ছেন আমাদের সঙ্গে। নাম আডাম টার্ন (Adam Tarn)। এসেছেন এখানে কয়েকটা দিন। নিজের মনে পড়াশুনো করেন। লেখেন না—লেখার মতন মনের অবস্থা নেই। সে-কথা প্রশ্ন করলে আগুন হয়ে উঠলেন। দেশের এক নামজাদা গুণীর মনের সন্ধান পেলাম। তারপরে এমনি আরও অনেকের সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে—লেখক, শিল্পী, সে আমলের নির্যাতিত গেরিলা সৈন্য। ভাব হল অনেকের সঙ্গে, ঘনিষ্ঠ কথাবার্তা হল। বছর পাঁচেকের ভিতর কত সোস্যালিস্ট দেশেই গেলাম। কিন্তু পোল্যাণ্ডের এঁদের মুখে এসব কোন আজব কথা! সমস্ত টোকা আছে বক্তাদের নামধাম সহ। আর এক মস্ত সুবিধা, সজ্জাদ জহির সে সময়টা সঙ্গে থাকায় বানানো বিবরণ কেউ বলবে না। কিন্তু আপাতত পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি, আজকের গল্প আলাদা।

হালফিল সাহিত্য কি রকম হচ্ছে আপনাদের ?

তিক্ত কণ্ঠে টার্ন বলেন, ঘোড়ার ডিম! সাহিত্য সৃষ্টির মন-মেজাজ কোথা ? আমার কথাই ধরো, তিন বছরের মধ্যে কোন নতুন নাটক লিখিনি। দেশ জুড়ে নৈরাশ্য—গমের ফসল কিসে বাড়ে তাই এখন ভাবছি। সাহিত্যের ফলনের জন্যে মাথাব্যথা নেই।

দেশে দেশে এই ব্যাপারই তো চলছে। তবু নাম করার মতো উপন্যাস কি বেরুল গত দশ বছরের মধ্যে ?

অ্যাডলফ রুদনিকের (Adolf Rudnick) খানকয়েক উপন্যাস। ভারী ওজনের নয়, ছোট ছোট বই লেখেন ইনি। সব চেয়ে ভাল হয়েছে জুকোলস্কি (Zhukolsky)। এ বইয়ের ইংরেজি হয়নি।

কথায় কথায় হাঙ্গেরির বিদ্রোহের প্রসঙ্গ ওঠে। গোলমাল পোল্যাণ্ডেও উঠেছিল, হতে হতে হল না। অক্টোবর মাসের ঘটনা বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, আমাদের অক্টোবর-বিপ্লব। গোমুলকা জনগণের মানুষ, সবাই তাঁর নামে উল্লসিত হয়ে ওঠে। জেলের মধ্যে পচছিলেন, জেল থেকে বের করে এনে রাষ্ট্রনায়ক করেছে। এই মানুষের হাতে যা-হোক একটা সুরাহা হবে এইবার।

আডাম টার্ন বলেন, দেখ, পোলরা ভাবপ্রবণ জাত। ইতিহাস পড়ে দেখ পুরানো আমল থেকে। তুর্কদের রুখেছিল পোলরাই, তারই জন্যে ইয়োরোপীয় সভ্যতা বেঁচে গেল। মরীয়া হয়ে লড়াই করে, আখের ভেবে দেখে না। ওয়ারশ শহরের চেহারা দেখেছ, হিটলারকে রুখতে গিয়ে ঐ দশা। আবার চেকোশ্লোভাকিয়া দেশটাও তো দেখে-শুনে এলে। তাদের কি—লড়াইয়ে ষোল-আনা লাভ তাদেরই। হিসেবি জাত। হিটলার ঝাঁপিয়ে পড়ল তো সেলাম ঠুকে জো হুকুম বলে দাঁড়াল। প্রাগ শহরে সাকুল্যে গোটা তিন-চার বোমা পড়েছিল, তার উপরে সিকিখানাও নয়। দেশটা চিরকালই অল্পবিস্তর শিল্পপ্রধান। চালু ফ্যাক্টরি পেয়ে হিটলার সেগুলো অনেক বড় করে ফেলল। লড়াইয়ের সাজ-সরঞ্জাম আর হাতিয়ার বানাত সেখানে। নাৎসিরা ধ্বংস হবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ফের সোস্যালিস্ট হল। সেই সব ফ্যাক্টরিতে রকমারি মাল বানিয়ে দুনিয়াময় চালান দিচ্ছে এখন। দেদার টাকা রোজগার করছে। আর পোল্যাণ্ডের যা-কিছু ছিল, সমস্ত গেছে। কয়লা আছে আমাদের, কাঁচা-লোহা আছে। কিন্তু ইস্পাতের কারখানা নগণ্য। কাঁচা মাল বাইরে পাঠাই, তাতে আর ক'টা পয়সা আসতে পারে বলুন।

এ সব আডাম টার্নের কথা, আমার কিছু নয়। সত্যি মিথ্যে জানিনে। যেমন শুনেছি, লিখে নিলাম। এর পরে আরও দু-পাঁচ

জনের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। পড়শি-দেশ চেকোশ্লোভাকিয়াকে একদম পছন্দ করে না, মোটমাট এটা বুঝে এসেছি।

টার্ন বললেন, অক্টোবরের গোলমালটা পোল্যাণ্ড বুঝসমঝ করে শেষ অবধি সামলে নিল। তাই একটা মজার কথা চালু হল : হাঙ্গেরি এবারে পোলদের মতন করেছে। পোলরা করেছে চেকদের মতো—

আর চেকরা ?

আডাম টার্ন হেসে নিচু গলায় বললেন, চেকরা করল শুয়োরের বাচ্চার মতন (They acted like pigs)।

ঘড়িতে দশটা। সন্ধ্যা সবে গড়িয়েছে। ডায়নামো চালিয়ে অল্পসল্প বিদ্যুৎ বানায়—বিদ্যুতের আলো টিমটিম করছিল, নিবে গেল এইবার। বাতিদানে বাতি বসানো। বাতি ধরিয়ে সেকেলে বনেদি ঘরের মধ্যে কারুখচিত সেকেলে টেবিলের ধারে বসে বসে এই লিখছি। অবাক লাগে। ইয়োরোপ কত লোকে তো বেড়িয়ে যান, কিন্তু শহরের এত দূরে অজ পাড়াগাঁয়ের ভিতর প্রিন্সের ক্যাসলে ক'জন বিদেশি রাত্রিবাস করেছে!

নামজাদা শিল্পীদের বড় বড় ছবি চতুর্দিকে। আর দেয়াল-জোড়া ফ্রেস্কো—পুরানো ধাঁচের ছোট ছোট ছবিতে ফ্রেস্কো ভরতি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কিছু বর্ণনা লিখে রাখছি : পাখাওয়ালা শিশুরা উড়ছে। দু'চাকার গাড়ি পরীরা মেঘের মধ্য দিয়ে টানছে। গাছতলায় ছোকরা প্রেম করছে তরুণীর সঙ্গে। কুকুর সঙ্গে নিয়ে ভেড়া চরাচ্ছে। ঘোড়ার উপরে এক পুরুষ—ঘোড়ার দড়ি ধরে নিয়ে যাচ্ছে আর একজন। উইণ্ডমিল।...এমনি সব সেকেলে ধরনের ছবি—ইয়োরোপের নানা জীবনচিত্র।

সমস্ত দিনের বৃত্তান্তগুলো মোটামুটি টুকে রেখে নিশিরাত্রে জানলায় গিয়ে দাঁড়াই। শীতার্ত রাত্রি—জানলা খুলে দিলাম তবু।

আর একদিন আজারবাইজানের বাকু শহরে কাস্পিয়ান সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে থাকার কথা মনে পড়ল। সেদিন অবারিত জল আর আকাশ। আজকে বনস্পতিরা ভূমিতল আচ্ছন্ন করে রয়েছে। নিঃশব্দ, নিশ্চল—মহাকালের মতো কত ঘটনার সাক্ষি। আকাশে চাঁদ উঠল গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে। কাস্পিয়ান সমুদ্র ফুঁড়ে সেদিনও এমনি চাঁদ-ওঠা দেখেছিলাম।

সকালবেলা পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল। আধেক ঘুমে মনে হল, গাঁয়ের বাড়ি চলে গিয়েছি বুঝি। চোখ মেলে চারিদিক চেয়ে তার পরে মালুম হল। গভীর একটা নিশ্বাস পড়ল—হায় আমার বাড়ি! কত রকম পাখির কাকলী। কোকিল ডাকছে, ঘুঘু ডাকছে। আর এক রকমের পাখি—আওয়াজ প্রায় আমাদের বউ-কথা-কও পাখির মতো।

দোতলায় মিউজিয়ামে প্রিন্সের আমলের প্রাচীন গৃহসজ্জা। রাজবধূ ও রাজকন্যাদের ছবি, কাপড়-চোপড়, বাক্স-পেঁটরা, তৈজসপত্র। মানুষগুলোই যা দেখতে পাইনে—তাদের জীবন-যাত্রার দিব্যি একটা আঁচ পেয়ে যাচ্ছি। রবিবার আজ। আশপাশের গাঁ থেকে ইস্কুলের ছেলেরা ও মেয়েরা মিউজিয়ামে আসছে। মাস্টার-মাস্টারনীরা সঙ্গে করে নিয়ে আসছেন। গেট পার হয়ে পায়চারি করতে করতে আমি জোড়া-গির্জা অবধি চলে গেছি। এ-রাস্তা ও-রাস্তা দিয়ে দল বেঁধে ছেলেমেয়েরা আসছে। পোশাকে ও চেহারায় গরিবানার চিহ্ন। ধুলো মেখে খালি-পায়ে আসছে অনেক শিশু। অনেকের জুতো আছে, মোজা জোটেনি। সেই কত দূর থেকে পায়ে হেঁটে হেঁটে সব আসছে।

পরের গল্পের একটুখানি এইখানে বলে নিই। বাচ্চাদের চেহারা ভাবতে গিয়ে লুইজির কথাগুলো মনে আসছে। ওয়ারশ'য় ফিরে হোটেলে উঠেছি তখন। এক বিকালে একলা পড়ে আছি,

সঙ্গীরা যে যার তালে বেরিয়ে গেছেন। লাউঞ্জে এসে তীর্থকাকের মতো আছি একটুকু কথাবার্তা বলব বলে। সেটা বড় সহজ ব্যাপার নয়। ইংরেজিনবিশ মানুষ অতিশয় দুর্লভ। অবশেষে একজনকে পাকড়াও করেছি—কথার পাশে কথা বসিয়ে 'আই লিভ ডিসট্যান্ট' ইত্যাকার ইংরেজি বলেন। কায়ক্লেশে তাঁর সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছি। হেনকালে লুইজি মেয়েটির আবির্ভাব। কোন দরকারে কার কাছে এসেছে, পাশের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছে। আমাদের কথার মাঝে হঠাৎ সে ইংরেজিতে ফোড়ন কেটে উঠল।

দোভাষির ব্যবস্থা করতে পারেননি এঁরা, বেশি সময় বোবা হয়ে ঘুরি। যেন স্বর্গ হাতে পেলাম: বাঃ রে, ইংরেজি জানো দেখছি তুমি।

সলজ্জে মেয়েটি বলে, না না। ভুল ইংরেজি, খারাপ ইংরেজি। ফরাসিটা বোধহয় একটু ভাল বলতে পারি এর চেয়ে।

ইত্যাদি, ইত্যাদি। মনের সুখে কথা বললাম অনেক। পরেও এসেছে—সব ভাল মেয়েটার, নামটা বদখত। লুইজি সেমটোসক (Luise Szemtoszczgk)। লুইজির একটা কথা মনে বড় দাগ কেটে আছে: বলতে পারো বোস, আমাদের দেশের নাম পোল্যাণ্ড কেন হয়েছে?

আমার মামুলি জবাব: পোল জাতের বসত বলে।

হল না। বলতে পারলে না মিস্টার লেখক। গরিবের দেশ, পুওরল্যাণ্ড—সেইটে সংক্ষেপ করে মাঝের 'ও'-'আর' ফেলে দিয়ে দাঁড়াল পোল্যাণ্ড।

যাকগে, ফিটন এসে গেছে, চলো একটা পুরানো জায়গা দেখে আসি। সাত-শ বছরের গণ্ডগ্রাম। ভারতের লোক তোমরা, পুরানোর কোন জাঁক করব, সাত-শ বছর তো নস্যি তোমাদের

কাছে। লাউইক (Lowicz) জায়গাটার নাম। দশ মাইল এখান থেকে। চলো।

মান্ধাতার আমলের ফিটন-গাড়ি আর রোঁয়া-ওঠা অস্থিসার ঘোড়া। তড়াক করে কোচবাক্সের উপর উঠে গাড়োয়ানের পাশে বসে পড়লাম। ঘড়র-ঘড়র করে চলেছি ধুলো উড়িয়ে। বিচিত্রতম অভিজ্ঞতা। কতই তো ইয়োরোপে ঘোরেন—গাঁয়ের রাস্তায় কোচবাক্সে গাড়োয়ানের পাশে বসে ঘুরেছেন, বলুন। সেই কালকের মতন আলুর ক্ষেত, কপির ক্ষেত, সরষে-ক্ষেত। ফলের বাগান—অজস্র আপেল পীচ আর স্ট্রবেরির গাছ। লাল রঙের চেরি থোলো থোলো ফলে আছে। পথেঘাটে যাকেই দেখি, চেহারায় গরিব বলে মনে হয়। কোচোয়ান গল্প জুড়ে দিল। পিছনের সিট থেকে জান মানে করে বুঝিয়ে দিচ্ছে: দু-ধারে এই যতকিছু, সমস্ত রোজবিলের সম্পত্তি। মস্তবড় জঙ্গলের মালিক—ঘোড়া ছুটিয়ে একদিনে সে জঙ্গল শেষ করা যায় না। রাস্তার ডাইনে প্রশস্ত জলা জায়গা—আমার দেশের বাঁওড়ের মতো, হোগলা জাতীয় গাছ জন্মেছে পাড়ের দিকে। গাড়োয়ান বলে, রোজবিল মাছের আবাদ করেছিল এখানে। জমিদারির এখানে ওখানে রোজবিল ঘরবাড়ি বানিয়ে রেখেছিল, অবরে-সবরে দু-চারদিন এসে থাকত। দশ মাইল পথের ভিতর অমন দু-তিনটে বাড়ি দেখিয়ে দিল।

শেষ-রোজবিলের কথা বলছে কোচোয়ান। বুড়ো নিজে মানুষ ভালো, কিন্তু বউটা হাড়বজ্জাত। বুড়ো দয়াধর্ম করতে চাইত, কিন্তু বউয়ের আট দিকে আটটা চোখ চরকির মতন ঘোরে। তার জন্যে কিছু হবার জো ছিল না—। জান হেসে ব্যাখ্যা করে বোঝায়: পুরুষ-পুরুষানুক্রমে রাজার শাসনে জীবন কাটিয়েছে—রাজভক্তি এদের হাড়ে-মজ্জায় মেশানো। কর্তাকে সোজাসুজি গালিগালাজ করতে পারে না, যত দোষ তাই বউয়ের ঘাড়ে চাপাচ্ছে।

এক জায়গায় এসে কোচোয়ান দেখায়: ঐ আমার বাড়ি। আগে কর্তার জমিতে খাটতাম—কর্তার দেওয়া চালাঘরে থাকতে পেতাম, এখন আমার নিজের জমি নিজের ঘরবাড়ি। দেহ বেজুত হল তো ঘরের মধ্যে গা এলিয়ে পড়ে রইলাম। আগে হলে, ওরে বাবা, শতেক কৈফিয়তে পার পাওয়া যেত না।

গির্জার চূড়া দেখা যায়, লাউইক দূর নয় আর বেশি। বাজার করে সব গাঁয়ে ফিরে আসছে। দু-হাত আড়াই-হাত লম্বা পাউরুটি কাঁধে ফেলে নিয়ে যাচ্ছে—এমন রাক্ষুসে রুটি আর কোনখানে দেখবেন না। পাড়ার ভিতরে এসে গেছি। কোত্থেকে এলো এই চেহারার কালো মানুষগুলো! বেশ একটা সাড়া পড়ে গেছে, বুঝতে পারছি।

পোস্ট-অফিসের সামনে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লাম। কিছু টিকিট-পোস্টকার্ড কিনব। লাল-গোলাপ ফুটে আছে। টকটকে লাল, আর আয়তনে স্থলপদ্মের মতো—এত বড় গোলাপ আর এমন ঘোর রং অন্য কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না।

সদ্য-বানানো নতুন বাড়ি—পোস্ট-অফিস দোতলার তিন-চারটে ঘর নিয়ে। মেয়েরা কাজ করছে। জান টেলিগ্রাম করতে ওদিকে গেছে। আমি পোস্টকার্ড কিনে একখানা লিখে ফেললাম ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এক নবীনা মা বাচ্চা কোলে কোন কাজে এসে দাঁড়িয়েছে। খুনসুটি করি একটুখানি বাচ্চার সঙ্গে। চশমা খুলে সেটা বাচ্চার সামনে ঘোরাচ্ছি। বাচ্চা হাসে, হাত বাড়ায় চশমা ধরবার জন্য। দিই না, একবার কাছে আনি আবার দূরে সরাই। মা-ও হেসে আকুল। আমার মুখে চেয়ে ফড়ফড় করে এক গাদা কথা বলে গেল। আমি তার কি বুঝব—জান কাছে নেই যে বুঝিয়েসুজিয়ে দেবে। হঠাৎ মা যেন ক্ষেপে গিয়ে চুমোয় চুমোয় আচ্ছন্ন করছে বাচ্চাকে।

নেমে এসে গাড়িতে উঠছি। সব চেয়ে বড গোলাপটার দিকে

তাকাচ্ছি বার বার। কেউ যদি তুলে এনে হাতে দিত! এক বুড়ি দেখি ছুটতে ছুটতে আসছেন। জানকে ডেকে বলেন, ভারতের মানুষ নাকি এরা? নেহরু-নেহরু করলেন বুড়ি বার কয়েক।

ওগো ভারতের মানুষ, আমাদের দেশ দেখে বেড়াচ্ছ—বেশ ভালো। ভালো হোক তোমাদের। ও-বছর তোমাদের নেহরু ওয়ারশ'য় এসেছিলেন। উঃ, কত লোক! ভলতাভা গাঙের লাগোয়া যে স্টেডিয়াম, অঞ্চলের লোক সেখানে ভেঙে পড়ল। আমিও গিয়েছিলাম এই এদ্দুর থেকে।

নেহরুর জয়-জয়কার দেখলাম—বিশেষ করে স্যোসালিস্ট দেশগুলোয়। এই সেদিন যেমন প্রাগের ক্রুসবা-হোটেলে। এক ঝি নিতান্ত গায়ে-পড়া হয়ে তার ইংরেজি-জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছে: নেহরু গুডম্যান। নেহরু লণ্ডনে এলেন, আমিও লণ্ডনে তখন। কিন্তু হৈ-চৈ দেখলাম না—খবরের কাগজের কোণের দিকে ইঞ্চি-মাপা একটুকু খবর।

যাক গে, গাঁয়ে ঘুরছি এখন। প্রাচীন ক্যাথলিক গির্জা—সাত-শ বছর বয়স। এমনি সব গির্জায় এসে আমার স্বদেশের মন্দিরের কথা মনে পড়ে যায়। উঁচু খিলান, অসংখ্য বিগ্রহ, গম্ভীর পরিবেশ। ভক্তিবিনম্র নরনারী—তার মধ্যে বুড়োমানুষ বেশি, মরণের ভয়ে যারা কম্পমান। আমাদের দেশে মন্দিরের পুরুতের যে খাতির, ঠিক সেই জিনিস এদের দেশে গির্জার পাদরির বেলা।

এই বেলা দুপুরে গির্জা নির্জন। ঘুরে ঘুরে দেখছি। অনেকগুলো বেদি—সকলের বড় বেদিটার উপর ক্রস ঢাকা দিয়ে রাখা। অগুন্তি প্রাচীন ছবি আর বিগ্রহ। মেয়েরা হাতের তাঁতে বোনা স্কার্ট পরে এই গাঁ অঞ্চলে। বিস্তর রঙিন স্কার্ট এ-বিগ্রহ ও-বিগ্রহের পায়ের নিচে ভক্তি ভরে কারা পেতে দিয়ে গেছে। আর ফুলের গুচ্ছ—টাটকা ফুল তুলে গোছা বেঁধে দিয়ে গেছে আজকেই। একেবারে জনমানব নেই ভেবেছিলাম, হঠাৎ

দেখি—তা সে না থাকারই শামিল—কোণের আধ-অন্ধকার বেদিতে মাথা গুঁজে একটি মেয়ে নিঃশব্দে প্রার্থনা করছে। আমরা এত জনে পাশ দিয়ে গেলাম, একটুখানি নড়ল না, ধ্যানের মধ্যে কোন্ কামনায় নিমগ্ন হয়ে রয়েছে। গির্জার মেঝেয় কবর—মেঝের ঠিক সমান লেবেল, কবর এতটুকু উঁচু নয়। পুণ্যার্থীরা গির্জায় এসে কবরের উপর দিয়ে ঘুরবেন, পায়ের ধুলো পড়বে—এই হল কামনা। এক বড়লোকের কবর—খোদাই করা আছে, তারিখ ১৬৭৩ অব্দ। আর এক কবর পুরুতের, তারিখ হল ১৬৪৩ অব্দ। তবে দেখুন, একেবারে আমাদেরই মতন কিনা। কালীঘাটের মন্দিরের সিঁড়িতে কত জনে নাম খোদাই করে রেখেছেন পুণ্যবানের পদধূলির কামনায়। ডুনিয়ার দেশে দেশে দেখে এলাম, মানুষ সব এক রকমের। মানুষ কেন মানুষকে ডরায় জানিনে। কেন মানুষ আলাদা হয়ে থাকে ?

এলাম বাজারখোলায় (Marketplace)। আমাদের হাট-খোলার সঙ্গে অনেকখানি মেলে। দোকানপাট নেই, চালাঘরও নেই—পাথরে-বাঁধানো চত্বর, তিন দিকে রাস্তায় ঘেরা, কয়েকটা বড় গাছ ছায়া করে আছে। সাত-শ বছরের জীবনধারা এখনো খানিকটা বজায় রয়েছে এই জায়গায়। গ্রাম-গ্রামান্তরের মালপত্র ব্যাপারিরা ঘোড়ায়-টানা ওয়াগনে করে নিয়ে আসে—আলু, শাক, কপি, গাজর, দড়ির জালের ভিতরে শুয়োর। এনে নামায় চত্বরের উপর। খুচরো খদ্দেরে দরদাম করে কিনে নিয়ে যায়। এত বেলায় এখন বাজার প্রায় ভেঙে গেছে। গাঁয়ের লোকে সওদা নিয়ে ফিরছে—মেয়েই বেশি। ভেড়া কিনেছে বুঝি ক-জনে মিলে—খুব স্ফূর্তি, হাসিমুখে তারা ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে চলল। কাঁচাপয়সা পেয়ে ব্যাপারিরা দম ভোর বিয়ার খাবে বলে সরাইখানায় ঢুকে পড়েছে। জানকে বলি, চলো, আমরাও একটু বসিগে সরাইখানায়। গেঁয়ো লোকের হৈ-হল্লাটা দেখে যাব।

গিয়ে বেকুব। মুহূর্তে সবাই নড়েচড়ে ভদ্র হয়ে বসল। একেবারে চুপচাপ—পটে আঁকা ছবি। আলাপ-পরিচয়ের কথাই ওঠে না—শিক্ষিত ভদ্রজনদের সঙ্গেই তো ভাষার ফেরে হিমসিম হয়ে যাচ্ছি। চলো জান, তবে অন্য কোথাও। বেচারারা রাত থাকতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। বাড়ি ফিরতে আবার কত পথ ভাঙবে। ওদের আমোদ মাটি হতে দেওয়া যায় না।

তখন ঐ বাজারখোলারই অন্য এক দিকে একটু ভদ্র সরাই-খানায় গিয়ে চায়ের বাটি নিয়ে বসলাম। একজনে উঠে এসে আলাপ করছেঃ ইংরেজি জানো? কোন্ দেশ থেকে আসছ—ইণ্ডিয়া? ওঃ, আমি আমেরিকার। মেরি, মেরি, সেকহ্যাণ্ড করে যাও ইণ্ডিয়ার মানুষদের সঙ্গে।

বর্ষীয়সী মহিলা উঠে এসে সেকহ্যাণ্ড করলেন। আবার নিজ টেবিল গিয়ে খানাপিনায় মজে গেলেন। জান বলে, অনেক আমেরিকান পোল্যাণ্ডে এসে কায়েমি বসত করছে, তাদেরই কেউ হবে। উঠে গেলাম তাই পরখ করতে। হলে তো ভালই হয়। ওঁদের কাছ থেকে অনেক খবর নেওয়া যাবে, ভাল ইংরেজি জানায় ভাল করে বলতে পারবেন।

তা নয়। নিউইয়র্কের বাসিন্দা, বেড়াতে এসেছেন আমাদেরই মতো। বলেন, দেখতে পাচ্ছ কী দারিদ্র্য এ-দেশের! কিন্তু যিনি বললেন তাঁর ধরনধারণও ধনীজনোচিত নয়। কী জানি, ভিতরে আর কোন্ ব্যাপার!

* * *

ফিরে আসছি। দেরি হয়ে গেছে, লাঞ্চের সময় পার হয়ে না যায়। গাড়ি খুব হাঁকাচ্ছে, সনসন করে চাবুক ঘোরাচ্ছে ঘোড়ার পিঠের উপর। এরই মধ্যে ঘরোয়া কথাবার্তাও একটু-আধটু হচ্ছে কোচোয়ানের সঙ্গে। দশ বছর বয়সে প্রথম সে ইস্কুলে যায়। চৌদ্দ বছর পর্যন্ত গিয়েছে। লেখাপড়া মোটমাট এই। নিজের

মেয়েকে সে-ই পড়ায়। বলে, নিরক্ষরতা একেবারে গিয়েছে এটা ঠিক নয়। তবে কমে গিয়েছে খুব। এক-শ'র মধ্যে জন তিন-চারের মতন এখনো নাম লিখতে পারে না।

বাতাস বইছে হু-হু করে। গমের পাতায় ঢেউ খেলে যাচ্ছে। পথের ধারে নয়ানজুলি, সতেজ সবুজ ঘাস জন্মেছে। গিন্নিবান্নি গোছের একজন উবু হয়ে বসে দড়ি ধরে গরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছে, ছেলে ধরে আছে আর-এক হাতে।

ওয়ারশ'য় অগ্নিকাণ্ড

বিকালে ওয়ারশ ফিরেছি সেই দূরবর্তী মফঃস্বল থেকে। দিনটা শনিবার।

বিকালবেলা। সে ভারি লম্বাচওড়া বিকাল—ন'টা অবধি। ন'টায় সূর্য ডোবে, সন্ধ্যা নামে। তার পরে রাত্রি। ফুড়ুৎ করে রাত্রি চলে যায় তিনটে বাজতে-না-বাজতে। ঘুমের ঘোরে মানুষ তখনও দরজা-জানলা এঁটে থাকে, সূর্য কখন উঠে গেছে টের পায় না।

ওয়ারশ'য় পৌঁছেছি পাঁচটা নাগাত। ডিনারের নেমন্তন্ন ভিন্ন এক হোটেলে। এসেই বেরিয়ে পড়েছি। খানাপিনা এবং আড্ডায় যথারীতি রাজা-উজির নিধন চলল আটটা অবধি, রীতিমত রোদ্দুর তখন। তারপরে বারমিশেলি নাচ-গান হৈ-হল্লার টিকিট কিনে রেখেছেন ওঁরা। ন'টায় শুরু। ট্যাক্সি মেলে না রাস্তায়, হাঁটতে হাঁটতে তথায় গিয়ে বসা গেল। হোটেলে ফেরত এসে শয্যা নিলাম—তার অনেকক্ষণ আগে বারোটা বেজে গেছে।

রাওমশায় ও তৎপত্নীকে ছ-তলায় দু-খাটওয়ালা ঘর দিয়েছে। বাকি তিন জন আমাদের সাততলায়। আলাদা ঘর প্রত্যেকের।

আমি একেবারে এক পাশে, ফাঁকায় পড়ে গেছি। অনেকটা দূরে পাশাপাশি ছ'খানা ঘরে ছুই পুরানো বন্ধু—আনন্দ ও জহির।

শীতের দেশ, আলো নিভিয়ে লেপের নিচে পড়েছি। এক-শ মাইল মোটরে ছুটে আসা, তারপরেও নানান ঝামেলা। এত কষ্টের পর উষ্ণ শয্যায় গা ঢেলে দিয়ে আরামের ঘুম দিচ্ছি।

মরে ঘুমাচ্ছিলাম এতক্ষণ। সহসা মনে হল, বাইরের করিডরে মানুষের আনাগোনা। ঘুমের মধ্যে কানে আসে দ্রুত চলাচলের শব্দ। অলস শয্যায় চোখ বুজে পড়ে ভাবছি, হোটেলের ব্যাপার তো—নতুন লোক এসে পড়েছে, অথবা পুরানো লোক চলে যাচ্ছে। এ-ঘরে ও-ঘরে দুয়োয় ঝাঁকাঝাঁকিরও আন্দাজ পাওয়া যায়। অবাক হবার কিছু নেই—কত চরিত্রের লোকের আনাগোনা, ফুর্তি-ফার্তি করে ঘরে ফিরছে হয়তো এই সকালবেলা। খুব খানিকটা সোরগোল হওয়ার পর হঠাৎ সব থেমে গেল। নিদারুণ রকমের স্তব্ধতা। চোখ বুজে পড়ে আছি, চোখে ঘুমও আছে—কিন্তু শান্তি পাচ্ছি নে। কেন জানি না মনে এল, আগুন-টাগুন ধরে গেল নাকি? এত রকমের ব্যাপার থাকতে ঐটেই কেন মনে এসে গেল, আজও তা ভেবে পাই নে।

মনের অস্বস্তিতে তারপর এক সময় তড়াক করে উঠে দরজা খুলে ফেললাম। যেই খুলেছি, আরে সর্বনাশ, ধোঁয়ার কুণ্ডলী ধেয়ে এসে ঘর ভরে দিল।

আগুন!

সাততলার উপর আমি। আমার শিয়রে জানলা—শিক নেই জানলায়। কিন্তু সেখান থেকে নিচের দিকে তাকিয়েই মাথা ঘুরে ওঠে, লাফ দেব কেমন করে? একটা ভাল ক্যামেরা কিনেছি বার্লিন থেকে—ক্যামেরাটা হাতের মাথায় পেয়ে শুধুমাত্র সেইটে গলায় ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। করিডর বেয়ে ছুটেছি। ধোঁয়ায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন, চোখে বড় কিছু দেখতে পাই নে, নিতান্ত প্রাণের

দায়ে ছুটেছি। ছুটতে ছুটতে করিডরের শেষ এসে গেল, সামনে দেয়াল। দেয়ালে আটকেছে, আর পথ নেই। উল্টোমুখে আবার নিজের ঘরের সামনে দিয়ে ছুটছি। কাল বিকেলবেলা মাত্র এসেছি, নিচে যাবার সিঁড়ি কোনদিকে বুঝতে পারি নে। ধোঁয়া বড় বেশি ঘন এখন, পাথরের মতন চেপে ধরছে, নিরন্ধ্র অন্ধকারে মনে হচ্ছে দম আটকে পড়ে যাব এখানে। আরও এগিয়ে আগুন চোখে দেখতে পাই—সাপের জিভের মতো লকলক করে জানলা বেয়ে রেলিঙের কাঠ বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। কোন দিকে একটা মানুষ নেই, সবাই পালিয়েছে। এই একটা তলায় শ-খানেক মানুষ থাকে। তার মধ্যে নব আগন্তুক বিদেশী একলাটি আমি— নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব। এখনই সংজ্ঞাহীন হয়ে মেঝেয় পড়ে আগুনে জীবন্ত দগ্ধ হব।

এত কথা লহমার মধ্যে ভেবে ফেললাম আর ছুটোছুটি তো আছেই। হাত পড়তে একটা কামরার দরজা খুলে গেল। ঢুকে পড়লাম। সুসজ্জিত দামি দামি জিনিসপত্রে বোঝাই। মানুষ নেই। কী আশ্চর্য! প্রাণ নিয়ে সকলে পালাল, আমি এক বিদেশী মানুষ পড়ে আছি—ডেকে দেবার হুঁস হল না কারো?

কামরা থেকে বেরিয়ে এদিক-সেদিক লক্ষ্যহীন ভাবে ছুটছি। আশা কিছু নেই, আগুন গ্রাস করে ফেলল বলে। প্লেন-দুর্ঘটনার সঙ্গে তুলনা মনে আসে হঠাৎ। ইঞ্জিন বিগড়েছে, কিম্বা কলঘরে আগুন ধরে গেছে—হু-হু করে নামছে প্লেন, ভূতলে পড়ে এই মুহূর্তে জ্বলেপুড়ে যাবে। প্যাসেঞ্জারের তখন যে অবস্থা, আমারও অবিকল তাই। ঘণ্টা নয়, মিনিটের ব্যাপার কয়েকটা—আগুনের গ্রাসে দুনিয়া থেকে আমি নিশ্চিহ্ন।

এমনি সময় পিছনে পায়ের শব্দ। মানুষ—একটি মেয়ে। আমার অদৃষ্টদেবতা তরুণী বিদেশিনীর রূপ ধরে দেখা দিলেন যেন। সে-ও আটকা পড়ে গেছে আমার মতো, ঘুম ভেঙে উঠে পালাচ্ছে।

আমায় অতিক্রম করে এগোল। যাবার সময়, আমার মনে হল, হাতের ইসারা করে গেল আমায়। করুক আর না-ই করুক, আমি মেয়েটার পিছন ধরেছি। প্রাণরক্ষার শেষ চেষ্টা। চলনে তার দ্বিধার ভাব নেই—হোটেলের পুরানো বাসিন্দা বুঝতে পারছি। আগুনের জাল কাটিয়ে বেরুনো—কেউ যদি পারে তো এই মেয়েটি।

লিফটের কাছাকাছি এসেছি। আগুন এইখানটা প্রবল। লিফটম্যান নেই, লিফট অচল। পাশ দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখের কাঠের দরজা দাউ-দাউ করে করে জ্বলছে। সে এমন, কাছে দাঁড়ানো যায় না। মেয়েটা কিন্তু ভ্রূক্ষেপ না করে এক ধাক্কায় দরজা ঠেলে ফেলে আগুন ভেদ করে ঢুকল। পিছনে অতএব আমিও। বাঁ-হাতে ছাঁকা লাগল—আর কিছু নয়। আমি একলা হলে কখনো ঐ আগুনে ঢুকতাম না অমন করে।

সিঁড়ি পেয়ে গেছি। ধাপ বেয়ে তরতর করে ছ-তলায়। কেউ নেই সেখানে তো ফের একটা তলা নেমে গেলাম। একজন দু জন দেখা যাচ্ছে এবার, তারাও নামছে। চার তলায় এসে দেখি করিডরের উপর যত মানুষের ভিড়। আমাদের দলের সি. ভি. রাও ও তাঁর পত্নী উমা দেবী ভিড়ের এক পাশে। উমা দেবীকে তরুণী বলা চলে। অবসরভোগী প্রবীণ আই. সি. এস. রাওমশায়কেও এতদিন খানিকটা তরুণ ভেবে এসেছি। কিন্তু আজকের এই প্রাণান্তক বিপদের মধ্যে পক্ক কেশ ও স্থবির চেহারা বেরিয়ে পড়েছে—সামলাবার অবসর পান নি। হায়-হায় করছেন তিনি, উমা দেবীরও আঁখি ছলছলায়মান। সাত তলার আগুন ছ-তলায় নেমে এসে জিনিসপত্র সমস্ত পুড়িয়ে দেবে, সেই বেদনা ওঁদের।

প্রাণের ভয়টা ঘুচেছে। এতক্ষণে হুঁস হল আমার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখবার। রাত্রে খালি-গায়ে শোওয়া অভ্যাস আমার। শীতের দেশ হলেও জামা-গেঞ্জি খুলে রেখে লেপের নিচে

গিয়েছিলাম। পরনে লুঙি। আরও এক বিদঘুটে অভ্যাস, একটা কিছু না পড়লে ঘুম আসে না। কাল রাত্রেও পড়তে পড়তে এক সময় শিয়রের পাশের নিচু টেবিলে চশমা খুলে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছি। সেই চশমা পরে বেরোবার ফুরসত হয় নি। চেহারাটা আন্দাজ করুন এবারে। পরনে চেক-কাটা লুঙি, আদুল বক্ষের উপর বার্লিনে কেনা ক্যামেরাটা ঝুলছে, পায়ে স্যাণ্ডেল ঢোকানো। টাকাপয়সা, পোশাক-আশাক, ভ্রমণের পাশপোর্ট-ভিসা ও অন্যান্য কাগজপত্র কামরার মধ্যে পুড়েছলে বোধহয় ছাই হয়ে গেল এতক্ষণে। আর এক বিপদ, আগুনের তাপে এতক্ষণ বুঝতে ওসব পারি নি, খালি গায়ে তুর তুর করে শীত ধরেছে। লুঙি-পরা মানুষ দেশে কেউ দেখে নি। এত বড় বিপদের মধ্যেও নগ্ন দেহ লুঙি-সমন্বিত আমি মানুষটি রীতিমত এক দ্রষ্টব্য বস্তু।

এখন ভাবছি, আগুন থেকে রক্ষা পেলেও প্রাণে বেঁচে থাকা আমার অদৃষ্টে নেই। নির্বান্ধব দূরদেশে একেবারে রিক্ত। পোল্যাণ্ডে আমাদের নিয়মদস্তুর দূতাবাস সেই—খান তিনেক ঘর ভাড়া নিয়ে গুটি তিন চার কর্মচারী শুধু। সেখানে গিয়ে অবস্থা নিবেদন করব, তারও কোন উপায় দেখি নে—এই অর্ধেক-নগ্ন অবস্থায় পথে বেরোলে লোকে ঢিল ছুঁড়বে। পাগলা-গারদে নিয়ে পুরবে। কিম্বা তার চেয়েও সাংঘাতিক—পাসপোর্ট-ভিসা বিহনে স্পাই সন্দেহ করে কোন পাতালে নিয়ে ফেলবে, দুনিয়ার লোক কোন দিন আমার ঠিকঠিকানা পাবে না।

ভাবতে ভাবতে মরীয়া হয়ে সিঁড়ি ভেঙে উপর মুখো ছুটলাম। জিনিসপত্র কতক অন্তত উদ্ধার করব। কিছু না হোক, পাশপোর্টের ছোট্ট খাতাখানা। প্রাণে বাঁচতে হলে খাতাটুকু নিতান্তপক্ষে চাই। কিন্তু পথ আটকাল। ফায়ার-ব্রিগেড এসে পড়েছে। আগুনের মধ্যে তারা যেতে দেবে না।

ধপ্ করে বসে পড়লাম সিঁড়ির উপরে। উপায় ? ফায়ার-ব্রিগেড

ভরসা দিল, আগুনের বেগ আটকানো গেছে। নিভে এসেছে, মিনিট পনের বড় জোর—

পনের মিনিট কেটে গেলে বলল, হয়ে গেছে, আর আধঘণ্টা। আধঘণ্টা পরে বলল, ঘণ্টা খানেকের বেশি কিছুতেই আর লাগতে পারে না।

অগ্নিকাণ্ডের কারণও শোনা গেল। বোমার ঘা খেয়ে খেয়ে হোটেল-বাড়ির কিছু আর নেই, তালিতুলি দিয়ে কোন রকমে কাজ চালানো হচ্ছে। শেষ রাতের দিকে জীর্ণ ইলেকট্রিক তারে কেমন করে আগুন ধরে যায়। ভাঙা দরজা-জানলার কাঠকুটো পাশে গাদা করা—আগুন তার উপর পড়ে লঙ্কাকাণ্ড। ছুটোছুটি লেগে গেল তখন। ঘরের মধ্যে লেপ মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত আলস্যে আমি সেই শব্দ শুনছিলাম।

মুলুকরাজ আনন্দ এবং সজ্জাদ জহিরের খবর মিলল আর খানিকক্ষণ পরে। আগুনের অনেকটা দূরে তাঁদের ঘর। জহির তবু টের পেয়েছিলেন। দরজায় ঘা দিয়ে মুলুকের ঘরে তিনি ঢুকে পড়েন। মস্ত এক সুবিধা, ওঁদের ঠিক নিচে ছ-তলায় যে কামরা তার একটু ঝুল-বারাণ্ডা বেরিয়ে আছে। ওঁদের জানলার নিচেই। সিঁড়িতে আগুন—সেদিকটায় না গিয়ে দুটো বিছানার চাদর একত্র পাকিয়ে জানলায় বেঁধে টপাটপ ওঁরা ছ-তলার ঝুল-বারাণ্ডায় নেমে পড়লেন। সে ঘরে জর্মন ভদ্রলোক একজন। গল্পগুজব করতে করতে ধীরেসুস্থে তারপর ওঁরা আরও নিচে নেমেছেন।

জেনেভার বন্ধু

জেনেভায় নামলাম, বিকাল পৌনে-চারটা। চেনা-জানা কেউ নেই, কারো নামে পরিচয়পত্র আনি নি। জায়গাটা দেখব ক'দিন ঘোরাঘুরি করে।

উঠি গিয়ে কোথায় এখন? ভারতের কনসাল-জেনারেলের অফিসে ফোন করি, তাঁরা যদি কিছু হদিস দেন। পাত্তা পাওয়া গেল না। (পরে টের পেলাম, অফিসের ঠিকানা বদল হয়েছে।) এরোড্রোমের এক অফিসারকে গিয়ে ধরলাম: হোটেল দেখে দিন। ঘুরে ঘুরে পয়সাকড়ি শেষ হয়ে এসেছে—দামি হোটেল নয়, গেরস্তপোষা চলনসই গোছের একটা।

ফোনের পর ফোন করে যাচ্ছেন তিনি। এক-একটি শেষ হয়, মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়েন। অর্থাৎ, হল না— এবারও নয়। জায়গা নেই কোন হোটেলে। এক জায়গায় অবশেষে দীর্ঘক্ষণের কথাবার্তা। আশায় আশায় তাকিয়ে আছি। পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু দু-জনের ঘর—একজনে থাকলেও ভাড়াটা ডবল দিতে হবে।

তথাস্তু। শীতের দেশ—রাস্তায় পড়ে থাকতে পারি নে। দেবেও না রাস্তায় থাকতে। অফিসার মশায় ট্যাক্সি ডেকে দিলেন আবার ফোনে। এতাবৎ যত জায়গায় ফোন করেছেন তার হিসাব দিলেন এবার। অঙ্কটা হেলা-ফেলার নয়। কম খরচায় চালাতে চেয়েছিলাম, শুরু থেকেই গচ্চা দিয়ে মরি।

যত টুরিস্ট ভিড় করে মধ্য-ইয়োরোপের মনোরম দেশ এই সুইজারল্যাণ্ডে। হোটেলের খুব ফলাও ব্যবসা। ট্যাক্সিওয়ালারা সব হোটেল জানে। দু-কদমের পথ, উঠে জুত করে বসতে না বসতে নামিয়ে দিল। ভাড়া দু-ফ্রাঙ্ক, অর্থাৎ টাকা আড়াইয়ের

মতো। তার উপরে বখশিস। দেওয়া না-দেওয়া আপনার ইচ্ছাধীন নয়—দিতেই হবে। অন্ততপক্ষে শতকরা দশ। তার উপরে যত বেশি দেবেন, সেলাম সেই অনুপাতে বড় করে মিলবে। ভাল ভাল হোটেলে পরিচারিকার এক পয়সাও মাইনে নেই। উল্টে মাসে মাসে তাকেই দিতে হয় চাকরিটা বজায় থাকবে সেই বাবদে।

হোটেল সেণ্ট গার্ভেইস (Hotel St. Gervais)। টেলিফোন পেয়ে ল্যাণ্ডলেডি অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্য। উঠে দাঁড়িয়ে মিষ্টি হাসি হেসে সমাদরে আহ্বান করলেন: ইণ্ডিয়া থেকে আসছ বুঝি? ইণ্ডিয়ার অনেক মানুষ আমার হোটেলে এসে গেছে। তাদের আমি জানি, বড় ভাল লোক। (মুখস্থ করা আছে —অজানা যে দেশের লোকই আসুক অবিকল এই কথাগুলো বলে থাকেন। খদ্দের ধরার নিয়ম।)

বললেন, ইণ্ডিয়ার কোন্ জায়গা থেকে আসছ তুমি?

ক্যালকাটা—

ভুল বলছ কেন গো? ক্যালকাটা নয়, কালকুত্তা। কালকুত্তার মানুষ অনেকে থেকে গেছে এখানে।

ইংরেজি বানান থেকে ঐ উচ্চারণ ধরে নিয়েছেন। হেসে বললাম, হল সেই কালকুত্তা। কিন্তু ঘর দেখিয়ে দাও মাদাম, মালপত্রগুলো রেখে আসি। ক্ষিধেয় পেট চনমন করছে।

ল্যাণ্ডলেডি হলেন মাদাম নাইভারগেট (A. Neivergett)। জবরদস্ত মহিলা। ক্ষীণজীবী স্বামীটি আছেন, ছুটোছুটি হাঁকডাক হাটবাজার এইসব কর্মে তাঁর প্রয়োজন হয়। ঘর দেখাতে স্বামী মহাশয় লিফটে নিয়ে তুললেন।

সরু চোঙের মতো বাড়ি। আমার ঘর নয়তলায়। ছোট ঘর, কিন্তু ছিমছাম। শুধুমাত্র সকালবেলার ব্রেকফাস্ট দেবে এরা, বাকি খাওয়া বাইরে। খাওয়ার চেষ্টায় বেরোচ্ছি। মাদাম

বললেন, অনেকদিন বাইরে বাইরে ঘুরছ, দেশি খানা নিশ্চয় পেটে পড়েনি। এখানে কিন্তু সে ব্যবস্থাও আছে।

ভারতীয় খাদ্যের নামে জিভে জল সরে। মাদাম দয়াবতী, নিজে সেই জায়গা দেখাতে চললেন। গোটা দুই মোড় ঘুরে আঙুল তুলে দেখালেন : লালরঙের বাড়ি দেখতে পাচ্ছ, ঐখানে—

ভোজনশালা রীতিমত সরগরম। সব টেবিল ভর্তি। দু-জনের ছোট এক টেবিলের একটা মানুষ উঠে গেল, সেইখানে চেপে বসলাম। বুড়োমানুষটি খাচ্ছেন, তাঁর খাওয়াও শেষ হয়ে এসেছে।

মধ্য ও পূর্ব-ইয়োরোপের নানা অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করে একটা জিনিস দেখেছি—কালো রঙের খুব কদর। নিতান্ত অন্ধজন ছাড়া এক নজরে সবাই বুঝতে পারে, আমি ভারতীয়। সেই সুবাদে ডেকে ডেকে আলাপ করতে চায়। অনেক জনের সঙ্গে ভাব করেছি।

এ বুড়োও তাই। ইতালির মানুষ, কাজ চালানোর মতন ইংরেজি জানেন। ভারতে গিয়ে একবার মাস কয়েক ছিলেন, মশলা-দেওয়া ঝাল-ঝাল সুপের স্বাদ পেয়ে এসেছেন। সেই থেকে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ান—জেনেভায় এলে নিশ্চিত এই ভোজনশালায় ঢুকবেন। ম্যানেজার চেনে তাঁকে। আমার সঙ্গেও আলাপ হল ম্যানেজারের। ভারতীয় খানার রহস্যটা জেনে নিলাম। গোড়ায় সত্যি সত্যি ভারতীয় পাচক ছিল একজন। মালিকের বদল হয়েছে, পাচকও তাই। এসিস্টাণ্ট হিসাবে যারা ছিল, তাদেরই একজন কিছু কিছু শিখে নিয়েছিল সেই সময়। সে-ই চালাচ্ছে। ঝালটা বেশ কড়া করে দেয়। ভারতীয় রান্নার নামটা চালু রয়ে গেছে—নামের টানে খদ্দের আসে।

আহার শেষ করে ইতালির ভদ্রলোক উঠে গেলেন। এক ছোকরা এসেছে ইতিমধ্যে। অন্যত্র খালি টেবিল সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। উনি উঠে গেলেই টপ্ করে জায়গা নিয়ে বসে পড়ল।

নাম ডানিয়েল এ. রীলফ্স্। হল্যাণ্ডের কোথায় বাড়ি। দুটো দিনে ঘণ্টাকয়েকের দেখা, আর দেখা হবে না জীবনে। কিন্তু কোনদিন সেই আমার নবীন বন্ধুকে ভুলতে পারব না।

জমিয়ে কথাবার্তা। কোথা থেকে আসছ? কী কাজ করো তুমি? কতদিন থাকবে জেনেভায়? ওয়েটার এসে দাঁড়িয়েছে খাদ্যের ফরমাস নেবার জন্য, ডানিয়েল কানেই নেয় না। গল্প আর গল্প—কথাগুলো কান দিয়ে চোখ দিয়ে গিলছে সে যেন।

বলে, খেয়ে উঠে কী কাজ তোমার?

কাজ আবার কী! বেড়াতে এসেছি, লেকের ধারে ঘুরব এখন খানিক। ঘুরে ঘুরে দেখব।

বিশাল লেক পাহাড়ের উপর, তারই দু-দিকে ছবির মতো শহর। আমরা উত্তর-পশ্চিম পারে—ঠিক উল্টো পারে পাহাড় ধাপে ধাপে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। শহর খুব বড় নয়। পথ হারায় না এখানে কেউ—জিজ্ঞাসাবাদ করে লেকের ধারে গিয়ে পড়লেই হল।

ডানিয়েল বলে, আমার গাড়ি আছে। লেকের ধারে তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাব। একটু বোসো, খাওয়া এই হয়ে গেল আমার।

গবগব করে মুখে পুরতে লাগল তাড়াতাড়ি যাতে শেষ হয়। লহমার মধ্যে লেকের কিনারে এসে পড়েছি। টু-সিটার গাড়ি, নিজে চালায়, আমি তার পাশে। রোন নদী দেশ-দেশান্তর ঘুরে লেকে এসে পড়েছে, লেক থেকে আবার বেরিয়ে আয়তনে সরু হয়ে পশ্চিমমুখো চলল। ডানিয়েল কেমিস্ট মানুষ—কেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট পেয়েছে, জল নিয়ে তার গবেষণা। এই জেনেভা-লেকের জল-পরীক্ষার কাজে সে রয়েছে। সেই সব কথাও উঠল। একটি জল-কণিকার লেক পার হয়ে যেতে পুরো একুশটি বছর লাগে। পরীক্ষা করে দেখেছে।

আসন্ন সন্ধ্যায় সারা দুনিয়ার নরনারীর লেকের ধারে ভিড়।

রকমারি বেশভূষা, হরেক ভাষায় কথাবার্তা। আন্তর্জাতিক সভাসমিতির বড় ঘাঁটি এই শহর, অগণ্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধে গোটা ইয়োরোপ লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল—এরা নিরপেক্ষ, সকলের বন্ধু, এদের গায়ে আঁচড়টি পড়ে নি। দুনিয়ার সকল জাতি বিশ্বাস করে এদের।

সেকালের জুলিয়াস সিজার ও একালের লেনিন-মুসেলিনী থেকে শুরু করে ইয়োরোপের বড়-মেজ-ছোট বহু নায়ক এসে গেছেন এখানে। সামান্য সাধারণেও দলে দলে আসে। কাজকর্ম নিয়ে আসে, স্বাস্থ্যের কারণেও আসে অনেকে। এই লেক, নদী, তুষারমৌলি আল্পস এবং ইতিহাসখ্যাত বিচিত্র সৌধাবলী বিদগ্ধ কবি ও ভাবুক জনদের দেশদেশান্তর থেকে টেনে নিয়ে আসে।

লেকের কিনারা ধরে ডানিয়েল আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে, দেখতে দেখতে যাচ্ছি। প্রশস্ত পথের উল্টোদিকে ঘরবাড়ি, দোকানপাট। পেভমেণ্টের উপর ত্রিপলের অস্থায়ী ঘর বানিয়ে কফিখানা। প্যারিসে এই বস্তু হামেশাই দেখা যায়, বার্লিনেও দেখেছি।

ডানিয়েল বলে, ওপারে যাই চলো। শহরের রূপ ওপার থেকেই ভাল দেখা যায়।

সারি সারি অনেকগুলি পুল—তার একটা ধরে পার হয়ে গেলাম। ঘড়ির রাজ্য—যেদিকে তাকাই, ঘড়ি। এপারে ওপারে কত যে ঘড়ির দোকান, গণনায় আসে না। ছোট্ট একটু খোপ—সেখানেও হাজার দু হাজার রকমারি ঘড়ি সাজানো। এত ঘড়ি কে কেনে রে বাবা! লনের ঘাস ও ফুলগাছ ছাঁটাই করে ঘণ্টা-মিনিটের অক্ষর বানিয়েছে, তার উপরে প্রকাণ্ড সাইজের ঘড়ির কাঁটা। মাটির উপরে সেই ঘড়ি ঠিক ঠিক সময় দিয়ে যাচ্ছে।

পার হয়েও চলেছি লেকের ধারে ধারে। কতদূর চললাম! ডানিয়েল বলে, আমাদের জায়গায় এসেছ দু-দিনের তরে। ভাল

দেশের মানুষ তোমরা, সৎ জাতি, দুনিয়ার সকলের ভাল চাও। একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেব—তা দেখ, আজকেই আমার যত কাজ পড়ে গেল। জরুরি মীটিং একটা অফিসের, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে সোজা আমি মীটিঙে গিয়ে বসব।

কিন্তু নামাবার নামও তো করে না। চলেছি, চলেছি। সন্ধ্যা নেমেছে। অনেকটা দূর এসে পড়েছি। শহরতলী জায়গা। জনবিরল পথ। ঘরবাড়ি কচিৎ একটা-দুটো চোখে পড়ে। ট্যাক্সি করে ফিরতে হবে, বেশ কিছু খরচা আছে সেই বাবদে।

গাড়ি থামাল সহসা ডানিয়েল। নামতে যাচ্ছি, নিষেধ করে: বসে থাকো গাড়িতে। আমি যাচ্ছি, এখনই ফিরে আসব।

হনহন করে চলেছে। রাস্তার বাঁক ঘুরে অদৃশ্য। গেল কোথা? বসেই আছি আমি। খানিক পরে ফিরে এসে ডানিয়েল বলে, মীটিঙে যাব না—ফোন করে এলাম। তোমায় নিয়ে ঘুরব। মীটিং কতই তো হবে, কিন্তু তোমায় নিত্যিদিন পাব কোথায়?

ঘণ্টা দেড়েকের পরিচয়, তার মধ্যে এইরূপ সঙ্গিন অবস্থা! মাথা খারাপ নাকি ছোকরার?

গাড়ি হু-হু করে ছুটিয়ে দিল।

যাও কোথা হে?

পাহাড়ের উপর। উঁচু থেকে দেখবে। জায়গাটা কত সুন্দর, ধারণায় আসবে তখন।

তারিখটা ২১শে জুন, ১৯৫৭। বুদ্ধ-জন্মের আড়াই হাজার বছর পুরল, সেই উপলক্ষে কিছু আগে জয়ন্তী-উৎসব হয়ে গেছে। ভুবনব্যাপ্ত সমারোহ। শান্তি মৈত্রী ও অহিংসার পরম উদ্গাতা ভগবান বুদ্ধ। দু-দুটো লড়াইয়ে ইয়োরোপ বেদম মার খেয়েছে। তৃতীয়-মহাযুদ্ধের শঙ্কায় কাঁপছে সেখানকার মানুষ। এমনি সময় আড়াই হাজার বছর আগেকার অহিংসা ও মানবিকতার প্রাচ্যবাণী নতুন করে ধ্বনিত হল। নবীন

প্রত্যাশার স্পন্দন উঠল সকলের অন্তরে। মাটির ক্ষুদ্রাকার একট বুদ্ধমূর্তির জন্য বার্লিনের তা-বড় তা-বড় ব্যক্তি আমার কাছে কত আগ্রহ প্রকাশ করেন। বলতেন, শিয়রে রেখে অনুপ্রেরণ পাব। হিটলারের দেশ জর্মনিতে এই ব্যাপার। সে কাহিনী লিখেছি আমি অন্যত্র।

ডানিয়েলের জিজ্ঞাসার শেষ নেই। কী আগ্রহ ভারতের মানুষের সম্বন্ধে! কেমন তাঁদের জীবনরীতি? মহাচরিত্র সাধু সন্তদের কাহিনী পুঁথিপত্রে পড়া যায়, তেমনি মানুষ আছেন এখনো ভারতীয় সমাজে? সত্যি সত্যি আছেন?

বলে, বিশ্বমানবতা নিয়ে একটা ভাল বই আমার কাছে আছে ইংরেজিতে। পড়বে?

বললাম, দিও তুমি, পাতা উল্টে দেখা যাবে। ভাল করে পড়বার সময় কোথা?

গাড়ি অবিরাম ছুটেছে। উঁচু থেকে উঁচুতে উঠছি। অনেক —অনেক নিচে শহর। অকস্মাৎ কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গাছপালা নিবিড় হয়ে আসে, মাঝ খানে সঙ্কীর্ণ সর্পিল পথরেখা। দূরে দূরে এক একটা আলো— ঘন অরণ্যের মধ্যে শঙ্কিত নিঃশব্দ প্রহরী।

কত দূরে নিয়ে যাচ্ছ?

চলোই না। সব কাজকর্ম আজ বন্ধ দিয়ে এসেছি।

মনে এবার ভয় ধরে যাচ্ছে। কতক্ষণেরই বা আলাপ—কী চরিত্রের মানুষ, কোন মতলব নিয়ে ঘুরছে, কিছুই জানিনে। অসহায় বিদেশি একলা প্রাণী—যৎসামান্য সঙ্গতিটুকু হোটেলে রেখে আসতে ভরসা হয় নি, সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি। জনহীন পর্বত-কন্দরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যদি পালিয়ে যায়?

বললাম, রাত হয়ে যাচ্ছে, ফেরা যাক।

রাত্রেই তো ভাল। শহর আলোয় আলো হয়ে গেছে

লেকের গায়ে বড় ফোয়ারা দেখে এলে, খাঁজে খাঁজে এখন রঙবেরঙের আলো দিয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখবে। সে ছবি কোনদিন ভুলবার নয়।

সর্বনাশ করেছে, কত দূরের কোন চূড়ায় নিয়ে তোলে ঠিক কি! এমনি সময় বৃষ্টি এলো ঝেঁপে। জলের ঝাপটা গাড়ির ভিতর এসে পড়ছে।

কড়া হয়ে বলি, ঢের হয়েছে, নেমে চলো এইবার।

ধারাবর্ষণের ভিতর বিপজ্জনক খাদের পাশ দিয়ে গাড়ি চালানো সত্যিই অসম্ভব হয়েছে। নইলে ছাড়ত না কখনো—চূড়ার উপরেই নিয়ে তুলত। বাদ সাধল বৃষ্টিতে—অনিচ্ছায় গাড়ির মুখ অগত্যা নিচু মুখো ঘোরালো। যে দিক দিয়ে উঠেছিলাম, সে পথে নয়—ভিন্ন পথে। শহরের এলাকার মধ্যে তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম।

কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! রাস্তার উপর বৃষ্টিজলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। গাড়ি রেখে দু-জনে আশ্রয় নিলাম ব্যালকনির নিচে। শেষটা দোকানের ভিতরে ঢুকে পড়তে হল। ভিজে জবজবে হয়ে গেছি।

বৃষ্টি কমল একটু। লেকের এপারে এসে গেলাম। শীতের দেশ, তার উপর কাপড়চোপড় ভিজে গিয়ে হি-হি করে কাঁপছি। ডানিয়েলেরও তাই। গরম হয়ে নেবার দরকার। রাস্তার উপরের কফিখানাগুলো দুর্যোগে সকাল সকাল বন্ধ হয়ে গেছে। খুঁজতে খুঁজতে গলির মধ্যে একটা মিলে গেল। খদ্দেরপত্তর নেই বলে তারাও বন্ধ করতে যাচ্ছে, হুড়মুড় করে আমরা ঢুকে পড়লাম।

ডানিয়েল বলে, আজ যেখানে আমাদের দেখা, ঠিক ঐ জায়গায় ঐ টেবিলেই কাল আবার খেতে আসবে। অফিসের কাজকর্ম চুকিয়ে আমিও যাব। তারপর বেরিয়ে পড়ব—কেমন? ক'টার সময় যাবে বল।

কফির দামটা কে দেবে, তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি। রাগ করে

বলি, খরচা করে এই এত পথ ঘুরিয়ে আনলে। কাল আবার ঘোরাবে, শাসিয়ে রাখছ। সামান্য কফির দামটাও যদি না দিতে দাও, আর আমার পাত্তা পাবে না। স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিচ্ছি।

ভয় পেয়ে নিরস্ত হল। বৃষ্টি আবার মুষলধারে শুরু হয়েছে। দরজা দেবে এরা, বেরিয়ে পড়তে হল। রাত দুপুরে হোটেলের দরজায় ডানিয়েলের গাড়ি এসে দাঁড়ায়। কী জানি, অসুবিধা হয় কিনা কোন রকম—ভিতর অবধি চলে এলো সে আমার সঙ্গে।

ল্যাণ্ডলেডি তখনও অফিসঘরে। ডানিয়েলকে দেখিয়ে একগাল হেসে বললেন, বন্ধু তোমার বুঝি? বন্ধুর গাড়িতে এসেছ?

ঘাড় নেড়ে বলি, চিরকালের বন্ধু আমরা। এইখানে এসে দৈবাৎ পেয়ে গেলাম।

অল্প সময়ের মধ্যে অনেক-কিছু দেখব। পরদিন ব্রেকফাস্টের পরেই বেরিয়ে পড়েছি। ফিরতেও দেরি হয়ে গেল। অপরাহ্নে হোটেলে এসে ঢুকেছি—ল্যাণ্ডলেডি বললেন, তোমার বন্ধু যে এসে খোঁজ নিচ্ছিল। একখানা বই দিয়ে গেছে।

মোটাসোটা বই—কাল যে বইয়ের কথা হয়েছিল। ভারি আশ্চর্য লাগে, এত ঘনিষ্ঠতা কেন? যাকে বলব, কেউ তো বিশ্বাস করবে না। বলবে, গল্প বানিয়ে বলছি—যা আমার পেশা।

ল্যাণ্ডলেডি বললেন, একসঙ্গে খাওয়ার কথা নাকি তোমাদের। বলল, তোমার জন্য সে অপেক্ষা করে থাকবে।

ছুটতে ছুটতে যাই। ভোজনশালার সামনে গাড়ির মধ্যে ডানিয়েল। ব্যস্ত হয়ে ঘড়ি দেখছে।

সোজাসুজি প্রশ্ন করি, ভারতের কথা এত জানতে চাও, ভারতের মানুষের উপর এমনধারা টান—কী ব্যাপার বলো দেখি?

ডানিয়েলের বাপ পণ্ডিতমানুষ। রামকৃষ্ণ-মিশনের একজন সন্ন্যাসীর কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল। গেরুয়া-পরা সেই সন্ন্যাসী

দু-একবার এসেওছেন তাদের বাড়ি, ডানিয়েল কিশোর বয়সে দেখেছে। বাপ মারা গেছেন অনেক দিন, সন্ন্যাসীরও কোন খোঁজ রাখে না। কিন্তু ভারতবর্ষকে ভালবেসে ফেলেছে।

বলে, ভারতে যাব আমি একবার।

সেদিন কিন্তু আমাদের বেড়ানো হল না। কী একটা বিষম দায়িত্বের কাজ—খাওয়া শেষ করেই সে ছুটল। বলে, কাল রবিবার —অফিসেই যাব না। কাল সন্ধ্যায় সারাক্ষণ একসঙ্গে থাকব।

কিন্তু দেখাসাক্ষাৎ সে-ই শেষ। জীবনে আর কোন দিন তাকে কাছে পাব না। রবিবার সকালেও বেরিয়েছি। ফিরে এসে ডানিয়েলের একটুকরো চিঠি—অফিসের কাজে সে বাইরে চলে গেল। বইটা ল্যাণ্ডলেডির কাছে রেখে যাই যেন, সেখান থেকে সে নিয়ে নেবে।

আমার জন্য রেখে গেছে টাইপ-করা কতকগুলো কাগজ। সুইজারল্যাণ্ড ও জেনেভার সম্বন্ধে কিছু কিছু জানতে চেয়েছিলাম তার কাছে। সেই বৃত্তান্ত।

আমার ক্ষণিকের বন্ধুর সেই কাগজগুলো বের করে উল্টেপাল্টে দেখছি আজ। ডানিয়েলের একমাত্র স্মৃতি আমার কাছে রয়েছে।

বার্লিনের চিঠি*

বার্লিনে এসেছি। হোটেল এডলনে আছি। যুদ্ধের আগে এটা ছিল ইউরোপের এক পয়লা-নম্বুরি হোটেল। ভিকি বামের 'গ্রাণ্ড হোটেল' উপন্যাস এই হোটেল নিয়ে। বোমা ফেলেছিল এর উপর, সমস্ত চুরমার হয়েছে, শুধু পিছন-দিককার একটা সারি টিকে গেছে কোন গতিকে। শ-চারেক মাত্র কামরা —এই নিয়ে বছর দুই আগে হোটেল আবার নতুন করে চালু

* মৌচাক-সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকারকে লেখা

করেছে। সামনের ইট-লোহা-রাবিশ সরিয়ে একটুকু উঠান হয়েছে, কিছু ঘাসও বসিয়েছে। কিন্তু বিশাল এক অংশ আধেক-ভাঙা হানাবাড়ির মত পড়ে আছে এখনো।

বার্লিনের সবচেয়ে বনেদি পাড়া। লড়াইয়ের বেশি আক্রোশ অতএব এই জায়গার উপর। তেতলার একটা ঘরে থাকি, লেখার টেবিলের গায়ে কাচের জানলা। জানলা দিয়ে অনেক দূর অবধি নজর চলে। কত লোক মরেছে, কত সর্বনাশ হয়েছে দেশ জুড়ে—হাহাকার শুনতে পাচ্ছি এখনো যেন। চ্যানসেরির বিরাট ধ্বংসস্তূপ—হিটলার যেখানটা থাকত। একেবারে শেষ সময়ে যেখানে ছিল। দেখলে ভয় করে। কশাড় জঙ্গল, পা ফেলা যায় না। বড় বড় কংক্রিটের চাঁই। ভারী ভারী লোহা দেশলাইয়ের কাঠির মতো ছড়িয়ে আছে এদিকে-সেদিকে। মাটির নিচে হিটলার নিরাপদ গোপন কক্ষ বানিয়েছিল—তার উপরের অংশ ধ্বসে গিয়ে লোহা-লক্কড় দাঁত বের করে রয়েছে যেন। অনেকখানি জায়গা—কেউ যায় না ওর ভিতরে, কাঁটা-তারে ঘিরে রেখেছে। সকল দিকে নতুন নতুন বাড়ি তুলছে, এমন পাড়ার মধ্যে চ্যানসেরিকে এত জায়গার দখল দিয়ে রেখেছে কেন কে জানে।

হোটেলের একেবারে লাগোয়া ভাঙাচোরা অট্টালিকার সারি। সরকারি অফিস ছিল। অফিস ছাড়িয়ে প্রেসিডেন্টের বাড়ি—ভন হিণ্ডেনবার্গ যেখানে থাকতেন। বিস্তর কারুকর্ম—এখন স্তূপাকার ভগ্নাবশেষ।

চ্যানসেরির জঙ্গলের সামনাসামনি রাস্তার ঠিক ওপারে সবুজ স্নিগ্ধ অপরূপ লন। এখন বসন্তকাল—শীতের বাড়াবাড়ি নেই, ফুল ফুটেছে, নানান রঙের বাহার। এই যে লন, এখানেও ঘরবাড়ি ছিল। ডক্টর গোয়েবল্‌সের বাড়ি ও অফিস। লড়াই সম্পর্কে যাবতীয় প্রচারের কর্তা ছিল গোয়েবলস—হিটলারের ডান-হাত। লনের ধারে ধারে অনেক নতুন বাড়ি

তুলেছে, সরকারি নানা বিভাগ। রেডিওর একটা স্টুডিও আছে এর মধ্যে, আমাদের সেখানে নিয়ে গেল। কথাবার্তা রেকর্ড করে নেবে। জিজ্ঞাসাবাদ করবে, সারা দেশে ছড়িয়ে দেবে আমাদের উত্তর।

যেমন, আমায় বলল—তোমাদের পেয়ে বড় খুশি হয়েছি। ভাল জাত তোমরা—কারো ক্ষতি করতে চাও না, মিলেমিশে থাকতে চাও সকলের সঙ্গে। তবু জিজ্ঞাসা করি, বিশেষ কোন-কিছু দেখবার প্রত্যাশা নিয়ে এসেছ নাকি আমাদের দেশে? আমি কি জবাব দিলাম জানেন?—তোমরা ছিলে রণদুর্মদ দাম্ভিক জাত। ইউরোপ তো বটেই, গোটা দুনিয়া জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলে। শাস্তিও তেমনি হয়েছে। এবারে দিব্যজ্ঞান পেয়েছ, দেখতে পাচ্ছি—শান্তিতে থেকে সামলে নিতে চাও। প্রাণপণে কাজে লেগেছ। ভারতেরও ঠিক এমনি পথ। অনেক দিন পরাধীন ছিলাম, কারো সঙ্গে ঝগড়াবিবাদ না করে তাড়াতাড়ি দেশ গড়ে তুলতে চাই। তোমাদের মতন আমাদেরও দেশ ভাগ হয়েছে। তোমাদের পূর্ব-জর্মনি পশ্চিম-জর্মনি ; আমাদের ভারত ও পাকিস্তান। দেখতে এলাম, তোমাদের এই দুই ভাগের মধ্যে সম্পর্কটা কি রকম।

এই বার্লিন শহরটাও দু-ভাগ হয়ে গেছে—পূর্ব-বার্লিন আর পশ্চিম-বার্লিন। যেমন ধরুন, কলকাতা শহরের কলেজ স্ট্রীট কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে বলে দিল ওর পূর্ব-দিকটা এক রাজ্য, পশ্চিম-দিকটা অন্য। অর্থাৎ বেলেঘাটার মানুষ রবীন্দ্রনাথের বাড়ি দেখতে চায় তো তাকে ভিন্ন রাজ্যে যেতে হবে। জিনিসপত্রের দামও এদিকে এক রকম, ওদিকে এক রকম। টাকাপয়সার (এদের টাকা হল মার্ক) দরও আলাদা। পশ্চিম-বার্লিন থেকেই অমনি যে বরাবর পশ্চিম-জর্মনি চলল, তা নয়। শুধু মাত্র শহরের ঐ অংশটুকু পশ্চিম-জর্মনির। দ্বীপের মতো। তারপর আবার পূর্ব-জর্মনির এলাকা। শ' তিনেক মাইল গিয়ে তবে আবার পশ্চিম-জর্মনি মিলবে। একটা আন্তর্জাতিক রাস্তা আছে

পশ্চিম-জর্মনি থেকে পশ্চিম-বার্লিন অবধি। যে-কেউ ঐ রাস্তায় চলাফেরা করতে পারো। কিন্তু রাস্তা থেকে এক পা নেমেছ কি অমনি পাশপোর্ট-ভিসা—নানানতরো বায়নাক্কা।

বার্লিন শহরে বেড়াতে বেড়াতে আঁতকে উঠি। তেরো চোদ্দ বছরে পরেও ধ্বংসের চিহ্ন চারিদিকে ছড়নো। কী সাংঘাতিক রকমের তোলপাড় হয়ে গেছে! রাইখস্টাগ অর্থাৎ পার্লামেণ্ট এখন ভুতুড়ে বাড়ি। খোঁড়া মানুষ নুলো মানুষ কত যে দেখতে পাই—যুদ্ধে হাত-পা খোওয়া গেছে। মড়াগুলো যেন থপথপ পা ফেলে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যার পর আমাদের এই তল্লাট একেবারে থমথমে হয়ে যায়। ভয় করে। সেদিন রাত্রে খুব বাতাস উঠেছিল। জানলা ভাল করে বন্ধ করিনি। ঘুমের মধ্যে শুনি, ঠকঠক করে কপাটে কে যেন ঘা দিচ্ছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসি। হাজারখানেক মানুষ মরেছিল শুধুমাত্র এই হোটেলের ভিতরে। বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করতে রাত দুপুরে উঠে এলো নাকি তারা?

স্প্রে নদী শহরে যেন পথ হারিয়ে ঘুরপাক খেয়েছে শতেক বার। তারপর এক-ছুটে অনেক দূর গিয়ে লেকে পড়েছে। লেক থেকে বেরিয়ে চলে গেছে উত্তরসাগর মুখো। এক রবিবারে স্টীমার চেপে ঐ নদী বেয়ে গিয়েছিলাম। সে কী আনন্দ! মনে হল ছুটির দিনে একটা মানুষ নেই বুঝি শহরে। মেয়ে-পুরুষ বাচ্চা-বুড়ো সবাই এসেছে। জলে ঝাঁপাচ্ছে, পোলো খেলছে, নৌকো বাইছে, মাছ ধরছে, জঙ্গলে চড়ুইভাতি করছে, ঘুমুচ্ছে পড়ে পড়ে রৌদ্রের মধ্যে বালির উপর। হুল্লোড়ে কান পাতা দায়। ভারতকে বন্ধু বলে ভাবে—শুনেছে, ভারতের মানুষ আমরা—ইস্কুলের বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো অবধি কথা বলতে এসে দাঁড়ায়। কেউ কারো ভাষা বুঝিনে। শেষটা এক দোভাষি এসে বাঁচাল। কত কী জিজ্ঞাসা। বলে, ভারতের ছেলেমেয়েদের আমাদের ভালবাসা জানিও।

ব্রাসেল্‌সের বিক্রমাদিত্য

নবরত্ন-পরিবৃত মহারাজ বিক্রমাদিত্য নন, হালফিলের হাস্যোজ্জ্বল বন্ধুবৎসল মানুষটি। বিক্রমাদিত্য নাম নিয়ে যিনি লেখেন। ব্রাসেল্‌স দূতাবাসের হোমরা-চোমরা একজন। বার্লিনে হঠাৎ তাঁর এক চিঠি : এত দূর যখন এসে পড়েছেন, আমাদের এ তল্লাটে ঘুরে যাবেন একটিবার। প্যারিসে পৌঁছে দেখি, চিঠি তিন-চারখানা তিন-চার জনের নামে : অমুক আসছেন। দেখবেন, কোন অসুবিধা না হয়, দেখিয়েশুনিয়ে দেবেন। বড় কাজের ঠেকা, নয়তো নিজেই চলে যেতাম। তার মধ্যে একটা চিঠি আমাকেও। বার্লিনে যা সমস্ত লিখেছিলেন—আসতেই হবে ইত্যাদি।

অতএব এক সকালে ট্যাক্সি করে স্টেশনে ছুটলাম, ব্রাসেল্‌সের গাড়ি ধরব। অফিস কামাই করে বিনয় বসু তুলে দিতে গেলেন। প্যারিসে ওঁদের বাড়ি ছিলাম। হোটেলে কিছুতেই উঠতে দেন নি, এই মাগগিগণ্ডার বাজারে বাড়িতে আটকে রাখলেন। কী যে আন্তরিকতা, ভাবতে গেলে অভিভূত হয়ে যাই। দূর বিদেশে আপন-ঘর পেয়ে গেলাম হঠাৎ, আর কোন ভাবনা রইল না। গাড়িতে তুলে দিয়ে নানান সতর্কবাণী বলে বিনয় বিদায় নিলেন।

সেকেণ্ড ক্লাস অর্থাৎ সকলের নিচু ক্লাসে চলেছি। এই ক্লাসেই চলাচল প্রায় সকলের। অতি-বড় ভারিক্কী হলে তবে উপরে যায়। প্যারিসের সীমানা ছাড়িয়েই মাঠ। তার পরে বনজঙ্গল, নিচু পাহাড় কেটে চৌরস করে রাস্তা বানিয়েছে। পুলম্যান নামে আন্তর্জাতিক কামরা জুড়ে দিয়েছে গাড়ির সঙ্গে। খুব জোরে চলছে, থামে না বড় কোথাও। নদীর ধারে বড়

ফ্যাক্টরির কাছে এসে গাড়ির গতি মন্থর হল। বিশাল রেল-ইয়ার্ডের পাশে এলাম। ইয়ার্ড ছাড়িয়ে গিয়ে জোর দিল আবার।

কামরায় নানা বয়সের পাঁচটা মেয়ে আর এক ছোকরা। এবং অধম তো আছিই। গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা-ওটা বের করে খেতে শুরু করেছে সবাই। তার মানে ব্রেকফাস্ট না সেরেই বেরিয়ে পড়েছে। ঝোপঝাপ জঙ্গল। চাষের ক্ষেত—পাইপের মুখের জলধারা ফোয়ারার মতন উঁচু হয়ে ক্ষেতের উপর পড়ছে। খাচ্ছে ওরা, শশব্যস্তে খেয়ে যাচ্ছে। আমার ঠিক সামনে তরুণী মেয়ে—ছিপছিপে গড়ন, সুন্দরী বলতে হবে, চেহারা দেখে বিশ বছরের বেশি মালুম হবে না। খাওয়া শেষ করে বাস্কেট থেকে এই মোটা ছবির বই বের করে পাতা উলটাচ্ছে। সকলেই দেখি বই নিয়ে এসেছে—খাওয়ার পর চোখের সুমুখে এক একটা বই খুলে আছে। যেন পণ করে আছে, বাইরের কিছু চোখ মেলে দেখবে না। এবং তাদের মুখও দেখতে দেবে না বাইরের কাউকে। ঐ প্রান্তে, দেখুন, ছোকরার গায়ে গা জড়িয়ে এক মেয়ে। গাড়ি যে অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছে, ছোকরা ম্যাপ খুলে বোধহয় তার নিরিখ নিচ্ছে, আর মেয়ে সেই সন্তোলব্ধ জ্ঞান ভাগাভাগি করে নিচ্ছে তার সঙ্গে।

দু'পা না যেতেই তো ইয়োরোপের একটা দেশ শেষ হয়ে আর একটায় গিয়ে পড়ি। একদিন তাই বলেছিলাম, আমার দেশ ইণ্ডিয়ার নাম করো তো কথায় কথায়—ইণ্ডিয়া কী বস্তু, তোমাদের ধারণায় আসবে না। রাশিয়া বাদে তামাম ইয়োরোপ একুন করলে যা দাঁড়াবে, তাই হল ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়ার মধ্যে এমনিধারা রেলে চড়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছিই—দুটো-তিনটে দিন কেটে যায়, তবু দেশের মুড়ো পাওয়া যায় না।

ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সীমান্তে এসে গেলাম দেখতে দেখতে। সামনের সুন্দরী তরুণী ছবির বই হাতে বসে বসেই

ঘুমিয়ে নিল একটু। গাড়ি থামল—অমনি সে চোখ মুছে খাড়া হয়ে বসে। এই এক সুবিধা যে আমাদের হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের মতো বর্ডারে এসে ঘণ্টা দুই-তিন ঠায় দাঁড় করিয়ে রাখে না। ট্রেনে উঠে পড়ে উভয় তরফের মানুষ—কাস্টমসের ফরম দিয়ে দেয়। টানা করিডর—চলতি গাড়ির কামরায় কামরায় ঘুরে যা-কিছু দেখবার দেখে নেয়।

শমন সম দুই মূর্তি আমাদের কামরায়। দেশে ফেরার মুখ এখন। অনেক জায়গায় ঘুরেছি—টুকিটাকি জমতে জমতে রীতিমত এক গন্ধমাদন দাঁড়িয়ে গেছে। জানি না, কোন্ কোন্ বস্তু এর মধ্যে কাস্টমসের আওতায় পড়বে। কাস্টমসের আইন পড়ি নি। আর, একবার পড়ে নিলেই তো হল না, দেশ বিভেদে আইনের রকমফের আছে। তবে তো আইনই শুধু পড়তে হয় বিদেশের কয়েকটা দিন! বুকের মধ্যে দুরু-দুরু—কী জানি কোন্ ঝামেলায় পড়তে হয় বিদেশ-বিভুঁয়ে! চাবি-হাতে সুটকেস খোলার জন্য তৈরি হয়ে আছি।

আমায় শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করল: ডিক্লারেশন যা দিয়েছ, তার বাইরের জিনিস নেই তো?

তার পরে ঐ রূপসী তরুণীকে নিয়ে পড়ল। বাস্কেট টেনে নিয়ে তন্নতন্ন করে দেখে। একবার দেখে হয় না, জিনিসগুলো তুলে দেবার সময় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে প্রতিটি জিনিস। বাঙ্কের উপরের ঢাউস বাক্সে থাবা মেরে বলে, নামাও—

সে বড় সহজ ব্যাপার নয়। তরুণী ধরেছে—কোণের ছোকরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। এবং ওরা দু-জন। তাই হিমশিম খেয়ে যায়। বাক্স খুলে দু-জনে দু-দিকে উবু হয়ে বসে শ্যেনদৃষ্টিতে দেখছে। পেলো না কিছু। তরুণী আবার চাবি দিয়ে ফেলল। বেলজিয়ামের ভিতরে ঢুকে ট্রেন সীমান্ত-স্টেশনে থেমে গেছে ততক্ষণে।

তরুণীকে বলে, নামতে হবে এখানে।

কোন-কিছু তো পাও নি। অনর্থক হয়রানি। আমার কাজের ক্ষতি করছ জবরদস্তি করে।

নিরুত্তরে তরুণীর যাবতীয় লগেজ তারা হাতে হাতে তুলে নিল। তরুণীও অগত্যা নেমে পড়ল। গাড়ির সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

ছোকরাটা ইংরেজি জানে, এতক্ষণের মধ্যে টের পাই নি। সামনাসামনি তরুণীর খালি জায়গায় বসল এসে এবার। আমার কৌতূহলী মুখের দিকে চেয়ে বলল, নিশ্চয় কোন জরুরি খবর আছে ঐ মেয়ের সম্বন্ধে। নয়তো এমন হয় না। মেয়েটা স্পাই হতে পারে। বাইরে এত ঠাটঠমক দেখতে পাও—অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় বাতাস বিষাক্ত এদেশের—নিশ্বাস নেওয়া দায়। বাইরের মানুষ দু-দিন চার দিন থেকে তোমরা ধরতে পারো না।

গাড়ি জোরে ছুটল আবার। ফ্যাক্টরি—একটা শেষ হল তো আর একটা। পাশ দিয়ে বড় খাল। খালের মুখ আটকে জলের লেভেল উঁচুতে রেখে দিয়েছে। পাল-তোলা নৌকো যাচ্ছে সারি সারি। বিষম গুমট। গাড়িতে পাখা নেই। এমন গরম আর কোন বছর পড়ে নি, পাখারও তাই এতাবৎ গরজ হয় নি। লোকে বলছে, আণবিক পরীক্ষার ফল। আবহাওয়া বিলকুল বদলে দিয়েছে। দরদর করে ঘাম ঝরছে—ভারী জামা খুলে ফেলল সবাই। আমিও।

ব্রাসেল্‌স স্টেশনে গাড়ি লাগলে ভয়-ভয় করছে। চিঠি যদি ঠিকমত না পৌঁছে থাকে! স্টেশন ভূঁইয়ের অনেক উঁচুতে—এসক্যালেটরে ওঠানামা। মালপত্রের পাহাড়—কামরা থেকে প্লাটফরমে নামাতেই প্রাণান্ত। মাল-বওয়া কুলি যে মেলে না, তা নয়। কিন্তু রেট শুনে পিলে চমকে যায়। তা ছাড়া এখানকার টাকাও তো ভাঙিয়ে নিতে পারি নি এখনো।

না, নির্ভয় হলাম। দুই কুনুইয়ে জনতা ঠেলে খুদ বিক্রমাদিত্য এগিয়ে আসছেন। এসেই বড় সুটকেসটা তুলে নিলেন হাতে। ভিন দেশের রুটি-গোস্তের শক্তি দেখি অনেক।

চলেছি। সে কি একটু-আধটু হাঙ্গামা স্টেশনের বিরাট গোলকধাঁধা পার হয়ে বেরুনো! বিক্রমাদিত্য নতুন গাড়ি কিনেছেন, চালাচ্ছেনও নতুন। ওদেশের এক মজা, গাড়ি চালাবার লাইসেন্স লাগে না—যার খুশি চালাতে পারে। নতুন চালক হয়ে মুশকিল হয়েছে তাঁর—সর্বক্ষণই গাড়ির উপরে থাকতে ইচ্ছে করে। হাত নিশপিশ করে স্টিয়ারিঙে হাত না রাখা পর্যন্ত। একসিলেটরে পা দিলেই গাড়ি যখন ছোটে, এবং যত জোরে চাপ দেবে গাড়িও ছুটবে তত জোরে—বিক্রমাদিত্য তাই গাড়ি ছেড়ে দিয়েই প্রাণপণ শক্তিতে বস্তুটা চেপে ধরেন। গাড়ির চাকা, মনে হয়, রাস্তার গায়ে আর থাকে না—উপর দিয়ে উড়ে চলে। পাশে বসে আমি চোখ বুজি সে সময়। প্রতিক্ষণ মনে হয়, গেলাম বুঝি সবসুদ্ধ তালগোল পাকিয়ে। সেই অন্তিম কাণ্ড চোখ মেলে দেখবার সাহস পাই নে।

মনে হত এই রকম। কিন্তু আসলে কিছুই না। বহাল তবিয়তে ঘুরেছি যে ক'টা দিন ওখানে ছিলাম। ওয়াটার্লু গেলাম, এণ্টোয়ার্পে গেলাম—বিশেষ করে রুবেনের বাড়িতে আর মিউসিয়ামে। সীমান্ত পার হয়ে উত্তর-সমুদ্রকূলে হল্যাণ্ডের দি-হাগ অবধি চলে গেলাম একদিন। সমস্ত বিক্রমাদিত্যের মোটরে, এবং তিনিই চালক। প্রতিক্ষণ 'এই গেলাম' 'এই গেলাম'—দুশ্চিন্তা। কিন্তু কিছুই হয় নি, সে তো বুঝতেই পারছেন। একটা মাছি-পিঁপড়ে পর্যন্ত চাপা পড়েনি পথের উপর।

'বিক্রমাদিত্য' নাম নিয়েছেন, কিন্তু সংসারের মধ্যে যাবতীয় বীরবিক্রম দেখলাম ভিন্ন ব্যক্তির। মুখ টিপে হাসেন কেন, সে

তো সকল ঘরেই—তাঁর সম্বন্ধে বলছি নে আমি। তার উপরেও আছে—সেই বীরাঙ্গনাকে পদে পদে ঘায়েল করছে বাচ্চা ছেলেটি। দু-বছর বয়স বললেন ওঁরা, চেহারাতেও তাই—কিন্তু মাত্র দুটো বছরের ভিতরে এত বুদ্ধি ও এতখানি ডানপিটেমি রপ্ত করেছে, বিশ্বাস করা দায়। ইয়োরোপে এবারের গরমের জন্য লোকে অ্যাটম-বোমার উপর দোষ দিচ্ছে, আবহাওয়া নাকি তছনছ করে দিয়েছে ঐ জাতীয় বোমায়। বিক্রমাদিত্যের ছোট্ট ছেলের ঐ রকম পাকা বুদ্ধি—আমার মনে হয়, তা-ও অ্যাটম-বোমা করেছে।

ওঁদের লাউঞ্জে বসে বই ঘাঁটাঘাঁটি করছি—ছিমছাম উজ্জ্বল পোশাকে এক রূপসী এলেন। হাতে ব্যাগ একটি। সকৌতুকে আমার দিকে একবার তাকিয়ে জুতো মসমস করে ভিতরে ঢুকে গেলেন। ক্ষণপরে আমিও গেছি—কী আশ্চর্য, একেবারে ভিন্ন বেশ গরবিনীর! আগের পোশাক ছেড়ে ফেলে বরাঙ্গে আধময়লা অ্যাপ্রন চাপিয়ে এঁটো-বাসন মাজছেন এখন তিনি। ঝি বলে কিন্তু হ্যাক-থু করবেন না। টাইম-বাঁধা কাজ—শনিবারে অর্ধেক ছুটি, রবিবারটা পুরো। এবং বেতনের পরিমাণ শুনলে হাঁ হয়ে যাবেন। যেমন-তেমন লোকে ঝি রাখতে পারে না। বিক্রমাদিত্য ঝি রেখেছেন যেহেতু খরচটা এম্বাসির। আজেবাজে এম্বাসি নয়—এম্বাসি অব ইণ্ডিয়া। দেশে থেকে বুঝতে পারেন না কত ঐশ্বর্য আর কী সমারোহ আপনাদের! আপনাদের হাই-কমিশনার শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী লণ্ডন শহরের উপর যে রোল্‌সরয়েস হাঁকিয়ে বেড়াতেন, গাড়িটা চোখে দেখলে বুক ফুলে ডবল হয়ে যেত। লণ্ডনের সেরা পল্লী অলডউইচে ইণ্ডিয়া-হাউসের বাড়িটা দেখা ইস্তক আমার তো চোখে পলক পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। প্যারিস এম্বাসিতেও এমনি এলাহি ব্যাপার। কোথায় বা নয়! বাড়ি বসে প্যানপ্যানানি—একবার বাইরে ঘুরে মালুম পেয়ে আসুন কোন খাঞ্জে-খাঁর নাতিপুতি আমরা!

যাক গে, ঝিয়ের কথা হচ্ছিল। শনিবারের সন্ধ্যাটা ফিঁয়াসের সঙ্গে এখানে-ওখানে ঘোরে, রবিবারে শহর ছেড়ে দূরপাল্লায় বেরোয়। আমার লুঙিটা কাচতে দিয়েছেন ঝিয়ের কাছে। নেড়েচেড়ে সে তো হেসেই খুন। বুঝতে পারে না কোন্ জাতের পোশাক, কেমন করে পরতে হয়। বলা হল, স্কার্ট—পুরুষমানুষ অনেকে আমরা স্কার্ট পরে বেড়াই, এ হল সেই বস্তু।

গ্রীষ্মের দেশ ইয়োরোপ

কত মিথ্যে যে চলে আসছে—ইয়োরোপ নাকি শীতের দেশ! এই সেদিন নানান রাজ্য ঘুরে এলাম ইয়োরোপের। দু-মাসও হয়নি। গরমে আইঢাই করছে মানুষ, স্বচক্ষে দেখলাম। প্যারিতে এক-শ পনের ডিগ্রি অবধি তাপ উঠেছিল, কাগজে দেখেছেন। বুঝুন তবে। আমাদের কলকাতায় অতদূর হয় না।

বার্লিনের ভয়াবহ চেহারা। লড়াইয়ের এই তেরো বছর পরেও ভুতুড়ে শহর বলে ঠেকে। সন্ধ্যার পরে বেরুতে ভয় করে—বিশেষ করে যে তল্লাটে হিটলার ও নাৎসি-কর্তাদের ঘাঁটি ছিল। শোধ নিয়েছে বটে বিজয়ীপক্ষ! বুঙ্কার—হিটলারের শেষ দিনের আশ্রয়—বার্লিনের কেন্দ্রদেশে যে জায়গা এখন আট-দশ বিঘের ঘন জঙ্গল পাহাড়ের মতন বড় বড় কংক্রিটের চাঁই ইতস্তত ছড়ানো এমনি অজস্র—হিসাব দিতে গেলে মহাভারত হয়ে যায়। মানুষগুলোও থপ্‌থপিয়ে চলে— সেই যে বোমার ঘায়ে হাজারে হাজারে মরে পড়েছিল, তারাই যেন উঠে আবার হাঁটনা শুরু করেছে।

স্প্রে নদী বার্লিনের সকল পাড়া ঘোরাঘুরি করে তারপরে একছুটে লেকে গিয়ে পড়ল। লেকের নাম মুজি। লেক ছেড়ে বেরিয়ে আবার চলল পাহাড়-জঙ্গলের দিকে। এক রবিবারে

স্টিমারে চললাম ঐ নদীপথ ধরে। আরে মশায়, শহরে ঐ রকম—এখানে এসে ছুটির দিনে সেই মানুষজনের কাণ্ড দেখে যান একবার। জল ঝাঁপাচ্ছে, নৌকো বাইছে, মাছ ধরছে ছিপে, চড়ুইভাতি ও হরেকরকম ফূর্তিফার্তি। শুয়ে পড়ে আছে বালির উপর, গাছের তলে, ঘাস-বনের মধ্যে। গরমে কাবু হয়ে পড়ছে—গরমের কারণে অত জল-ঝাঁপাঝাঁপি। গরম সওয়া অভ্যাস নয় ওদের—এত গরম কোন পুরুষে কেউ শোনেনি। জর্মনির গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি মোটরে। যেখানে একটু খানাখন্দ পেয়েছে, সেইখানে মানুষের ভিড়। নগ্ন-গায়ের মানুষ—গোলাপফুল থাক দিয়ে দিয়ে রেখেছে, অনেক দূর থেকে এমনি মনে হবে। চিরকালের জল-চোরা জাত—তাদের কি গতিক দাঁড়িয়েছে বুঝুন এইবার।

জর্মনি ছেড়ে আসছি। এরোড্রোমে গুণী-জ্ঞানী অনেক জন বিদায় দিতে এসেছেন। বোদে উশে খুব নামি ঔপন্যাসিক—জর্মন আকাদেমি অব আর্টসের সম্পাদক তিনি। আকাদেমির নিমন্ত্রণেই আমরা পূর্ব-জর্মনি ঘুরতে গিয়েছিলাম। উশে হাসতে হাসতে বললেন, মশায়রা বুঝে যাচ্ছেন,—এবং হয়তো বা কেতাবেও লিখে বসবেন—জর্মনি হল ইউরোপের মধ্যে সব চেয়ে গরম দেশ।

কিন্তু জর্মনি বলে কি—ইয়োরোপের যে তল্লাটে গিয়েছি সর্বত্র ঐ এক দশা। লোকে বলাবলি করে, আণবিক পরীক্ষার দরুন এমনি সব ঘটেছে। আবহাওয়া বিলকুল বদলে গেছে। আর মুশকিল হয়েছে, পশমের আঁটো পোশাক পরতে হয়—পুরুষের বেলা তো বটেই। হালকা সূতি পোশাক কেউ রাখে না; ইলেকট্রিক-পাখাও নেই কোন বাড়ি। কেউ কোনদিন ভাবতে পারেনি, পাখার দরকার পড়বে। পাখা বানিয়ে গ্রীষ্মের দেশে বরাবর চালান দিয়ে এসেছে।

লণ্ডনে এক দুপুরে লাঞ্চে গিয়েছি এক চীনা-রেস্তোরায়। সব ঘর প্রায় খালি—দোতলার একটা ঘরে যাবতীয় মানুষ। কী বৃত্তান্ত? কোত্থেকে এক টেবিল-ফ্যান জোগাড় করে সেইটে চালিয়ে দিয়েছে। একটুকু হাওয়ার লোভে খানা-টেবিল ছেড়ে গাদাগাদি হয়ে সব দাঁড়িয়ে আছে। পাখার খবর একটু-আধটু বাইরেও চাউর হয়েছে—আরও মানুষ আসছে। এসে উঠে যাচ্ছে সোজা উপরতলায়। কাজকর্ম বন্ধ হবার জোগাড়। একটুকু টেবিল-ফ্যান—তারই খাতির এমন লণ্ডন শহরের উপর।

টেমস নদী বেয়ে একদিন গেলাম বোটানিক্যাল বাগানে। বাগান দেখার চেয়ে জলের উপর ঘোরাঘুরি করে একটুখানি ঠাণ্ডা হব, যেই লোভ বেশি। বাগানে পৌঁছে তারপরে গড়িয়ে পড়ব কোন এক ঝোপঝাপের নিচে। শহরের সীমান্তে কিউঘাটে নামলাম। দেখবার বস্তুই বটে, সারাদিন ঘুরেও দেখা শেষ হয় না। কাচের ঘরের ভিতর আমাদেরই দেশের গরম আবহাওয়া বানিয়ে সেখানে ঝিঙে, উচ্ছে, লাউ, কুমড়ো মায় কচুরিপানার চাষ করেছে। ফিরে আসছি, চড়া রোদ তখনো। বিষম গুমোট, একটুকু হাওয়া নেই, একটি গাছের পাতা নড়ে না। বিপদ দেখুন, এর উপরে পশমের কোট-প্যাংলুন-মোজায় সর্বদেহ মুড়ে রাখতে হয়েছে। মোজা বাদ দিয়ে শুধু-জুতো পরলেও পোশাকি সভ্যতা অমনি নাকি হায়-হায় করে ওঠে—উলঙ্গ বিবেচনা করে মানুষজন মনে মনে জিভ কাটে। যত কিছু পুরুষের বেলা। মেয়েদের সাতখুন মাপ। গ্রীষ্মতাপে তাঁদের স্বল্প বাস স্বল্পতম হয়েছে। এতে কোন কথা নেই। এদেশে যত লজ্জা পুরুষের, মেয়েদের কোন দায় নেই। আমাদের দেশের ঠিক উল্টো। (যখন লিখেছিলাম তখনকার কথা—এখন আর সেদিন নেই)।

থাক সে সব। ফিরছি কিউ-গার্ডেন থেকে স্টিমলঞ্চে। আর পারি নে, পশমের জামার নিচে আত্মারাম আইটাই করছে।

শেষটা মরীয়া হয়ে দিলাম জামার কয়েকটা বোতাম খুলে—যা হবার হোক, যায় যাক ধরিত্রী রসাতলে চলে। এদিক-ওদিক সভয়ে তাকাই। অনতিপরে লক্ষ্য হল, দৃষ্টান্ত অনেকেই অনুসরণ করছেন। সাহস পেয়ে কোট খুলে তখন কাঁধের উপরে ফেললাম। দরদর ধারে ঘাম ঝরছে। বীরত্ব দেখে পাশের মানুষটি ঘনিষ্ঠ হয়ে এলেন আলাপ-পরিচয় করতে: দেখছেন কি, পুরোপুরি গ্রীষ্মের দেশ হয়ে উঠল। সারা শীতকালের মধ্যে এবার লণ্ডনে একদিন মাত্র বরফ পড়েছিল। দু-এক বছর এমনি হলে পোশাকের ধাঁচ বিলকুল বদলাতে হবে।

ক্রমশ ঠাহর হল, টেমসের উপরে আমি যেটা করলাম, দায়ে পড়ে তার চেয়েও গুরুতর অবস্থায় লণ্ডনের পথে-ঘাটে মানুষ চলাফেরা করছে। একেবারে আদুল গায়ে হাজার চোখের সামনে দিয়ে সাইকেল চেপে যাচ্ছে—ভাবতে পারতেন আগে? একদিন দেখলাম, ঠিক দুপুরে এক প্রবীণ ব্যক্তি রাস্তার কলের পাশে উবু হয়ে বসে মাথায় ও গায়ে জল থাবড়াচ্ছেন। পথে এসো চাঁদ—আমাদের সঙ্গে তবে আর তফাৎ রইল কোথায়?

ইস্ট-এণ্ডের হাটবার

সাহেবদের দেখাদেখি সেকালে আমাদেরও কেউ কেউ বিলাতকে বলতেন 'হোম'। লণ্ডনের টিকিট কেটে জাঁক করে দেখাতেন: হোমে যাচ্ছি। আমারও সেই গতিক।

ইয়োরোপের বিস্তর অঞ্চলে চক্কোর দিয়ে বেড়িয়েছি। দোভাষিণী মাত্র সম্বল। চোখ-কান-মুখ থাকা সত্ত্বেও উক্ত ঠাকরুন বিহনে আমি কানা-কালা-বোবা। ঘরে-বাইরে কত সব লেখাজোখা, মানুষজন হাসি-স্ফূর্তি রঙ্গ-রসিকতা করছে—তার মধ্যে মূর্খস্য মূর্খ

আমি হাত ঘুরানো, চোখ ঠারা ইত্যাদি আদিম ব্যবহার নিয়ে আছি। সকলের মধ্যে বিচরণ করেও তাদের কেউ নই। তাজ্জব অবস্থা। মরবার পরে ভূত হয়ে বুঝি এমনিতরো ঘটে।

কিন্তু ডোভারের মাটিতে পা দিয়েই হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। যে যা বলছে, বুঝতে পারি। যেখানে যত লেখা বিলকুল পড়ে ফেলি। বাড়ি এসে গেলাম নাকি? নানান ঘাটের জল খেয়ে এসে তাই এবারে মনে হচ্ছে। খড়ির পাহাড়, রেলরাস্তার টানেল সবই তো চেনা আমার। বলে যাচ্ছি, বর্ণনা মিলিয়ে নিন। চোখে কখনো না-ই দেখি, লণ্ডনের শহরের নাড়ি-নক্ষত্র জেনে বসে আছি কেতাবের মারফত। গোটা শ্বেতদ্বীপেরও বিস্তর জানি।

ছোট্ট বয়সে, মনে পড়ে, এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ড্যাফোডিলের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন—ওটা হল এক রকমের পোকা। সেই পোকা চোখের সুমুখে আজ ফুলের সমারোহে চারিদিক ছড়িয়ে আছে। উইপিং-উইলো বোঝাতে গিয়ে সেই তিনি মাথা চুলকে বললেন, কোন শোকাতুরা স্ত্রীলোক। সত্যি তাই। আমার জানলার ওধারে বিশাল এক উইলো গাছ—অজস্র ডালপাতা ঝুলে রয়েছে ঝাঁকড়া-চুল ডাইনি বুড়ির মতো। যা-কিছু দেখতে পাই, আগেভাগে বর্ণনা পড়েছি, হয়তো ছবিও দেখেছি। রাস্তার নামও অচেনা নয়।

বর্তমান শুধু নয়, জানি এদের অতীতও। পথে-পার্কে যাদের হামেসাই দেখছি, তাদের অনেকের চেয়ে অনেক বেশি জানি। একদিন মাদাম তুষোর মোমের-পুতুল একজিবিশনে গেলাম। ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি সকলে ছাপা-ক্যাটলগের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে বিস্তর গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছে, আমরা মূর্তির সামনে গিয়ে অবলীলাক্রমে বলে দিইঃ ইনি ড্রেক, উনি ভলতেয়ার, ঐ হলেন চশার, এই দেখ লণ্ডন-টাওয়ারে রাজপুত্রদের হত্যার দৃশ্য···ওরা অবাক চোখে তাকায়, হয়তো বা ভাবল—ফকির-জ্যোতিষী-

জাদুকরের দেশ—আঙুল গুণে টপাটপ বলে দিচ্ছে। আরে বাপু, দু-শ বছরের ঘরকন্না যে তোমাদের সঙ্গে। পেটের দায়ে জানতে হয়েছে। তোমাদের যাবতীয় একাল-সেকাল নখদর্পণে নিয়ে আছি, রাজরাজড়ার কুলজি মুখস্থ সাল-তারিখ সুদ্ধ। তবু তো চাকরি মেলে না।

জ্যোতিষীর কথা উঠল তো বলি। লণ্ডনেও ওঁদের একটিকে দেখলাম। লম্বা ঝুলের গলাবন্ধ কোট, কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা। হাজার জনের মধ্যে নজর পড়বে। নজরে পড়বার জন্যই তো আয়োজন। দুটো-চারটে কথা হল পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে। নিতান্ত দায়সারা গোছের—বলছেন ভিন্ন দিকে তাকিয়ে। বলতে বলতে হঠাৎ মক্কেলের গন্ধ পেয়ে হনহন করে ছুটলেন। আমি হতভম্ব।

জ্যোতিষী আরও একজন আছেন নাকি। তিনি বনেদি। রাস্তায় ছুটোছুটির ব্যাপারে তিনি নেই। ঘরভাড়া নিয়ে রীতিমত অফিস সাজিয়ে বসেছেন। খবরটা শুধুমাত্র শুনেছি—নাম-ঠিকানা নেবার আগেই পণ্ডিতমশায় মক্কেল ধরতে ছুটে বেরোলেন। দোষ দিইনে। অফিসের ছুটি হয়ে ফুটপাথ ধরে জনতার স্রোত বইছে। দিনের মধ্যে এই সময়টুকুর জন্য তাক করে থাকেন—এখন থেকে একঘণ্টা দু'ঘণ্টার মধ্যে যত-কিছু কাজকারবার। হেন অমূল্য সময় আমার সঙ্গে ভ্যানর-ভ্যানর করে কাটানো চলে না।

গিয়ে দাঁড়াবেন কোন-এক মোড়ের মাথায় নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে। মক্কেলের মধ্যে সাড়ে-পনেরআনা মেয়ে—কমবয়সি মেয়ে। তাদের দিকে তাকাবেন। চোখাচোখি হল তো মৃদু শিরকম্পন। ব্যস, লাগবার হয়তো এতেই লেগে যাবে। চেহারা দেখে কানা মানুষও বোঝে ভারতের মানুষ ইনি। সিঁদুরের ফোঁটায় বোঝা যাচ্ছে ভূত-ভগবান ও ভবিষ্যতের ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া

করেন। যার গরজ সে আসবেই এগিয়ে, চুম্বকের আকর্ষণের মতো কাছে এসে দাঁড়াবে।

পণ্ডিতমশায় মোলায়েম দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন, হয়তো বা চুকচুক করলেন একটু মুখে: টান ছোঁড়াটারও আছে মা, কিন্তু মুশকিল করল মাঝে এক শয়তানী এসে পড়ে—কিংবা: ছোঁড়া লোক সুবিধের নয়, তার চেয়ে আর একজন যে দূরে দূরে বেড়াচ্ছে···। মেয়ে মাত্রেরই প্রেমঘটিত ব্যথাবেদনা থাকবেই, টোপ গাঁথতে ঐ বয়সের দেরি হয় না। অবস্থার গুরুত্ব অনুসারে এর পর পার্কে গিয়ে লক্ষণ-বিচারেও বসতে হয় কোন কোন মক্কেল সহ। ঝাড়ফুঁক তাগা-মাদুলির ব্যবস্থা আছে কি না, জিজ্ঞাসার ফুরসুত পাইনি। হপ্তায় পাঁচ-সাত পাউণ্ডের মতো দক্ষিণা জোটে। এক প্যাকেট সিঁদুর মূলধনে রোজগারটা নিতান্ত হেলাফেলার নয়, কি বলেন?

রবিবারে ইস্ট-এণ্ডে হাট বসে। লণ্ডনে গিয়ে যেমন বৃটিশ-মিউজিয়াম দেখেন, হাটখোলাতেও তেমনি দুটো-একটা পাক দিয়ে আসবেন। দোকানের জন্য চালা বেঁধে দিয়েছে—কিন্তু কতটুকুই বা জায়গা, আর ক'খানাই বা চালা! ঐ অঞ্চলের কোনখানে রবিবারে গাড়ি চলে না। রাস্তা জুড়ে দোকানপাট, কেনাবেচা, হাটুরে মানুষের হৈ-হল্লা, গাড়ি ওর ভিতরে ঢুকবে কোথায়? যার যেখানে খুশি দোকান দিয়েছে। সস্তা-সস্তা বলে চেঁচাচ্ছে চতুর্দিকে। রীতিমতো বক্তৃতা ফেঁদেছে—যার মর্ম হল, এমনিতরো জিনিস এই দামে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবনের মধ্যে কেউ দিতে পারবে না। হঠাৎ বা হাতুড়ি দিয়ে প্যাকিং-বাক্স দমাদম পিটতে লাগল: গেল, গেল রে, একেবারে জলের দামে চলে গেল। একটা সার্টের দর ধরুন, চেয়ে বসল পনের বব। হাটের গতিক আপনার জানা আছে: পাঁচ বব দিতে পারি। দোকানদার এই মারে তো মারে! গম্ভীর চালে, আপনি চলে যাচ্ছেন। তখন ডাকছে: শোন শোন—আট

ববে কেনা আমার, তাই দিয়ে যাও, তোমার কাছে লাভ করব না। এখন বুঝেছেন, অসুধ ধরে গেছে। দরদাম করে দেখছিলেন, কিনতে তো আসেননি। না না—বলে ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দেবার তালে আছেন। তখন হয়তো ছুটে এসে আপনার হাত এঁটে ধরে হিড়হিড় করে টানতে লাগল।

এই দরাদরি কেবল ইস্ট-এণ্ডে—এবং একটা দিনের জন্য। অন্য কোনখানে বাঁধা-দরের একটি পেনি কমিয়ে আসুন দেখি। লোকে ভাবতেই পারে না। রবিবার বলে সভ্যতার নিয়মশৃঙ্খলাও যেন একটা দিনের ছুটি নিয়ে নিয়েছে।

বানর-নাচ হচ্ছে এরই মধ্যে। ভিখারিরা ভিক্ষা চাইছে—সাহেব ভিখারি, কেতা দুরস্ত। টেবিল সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দান করে আপনি কৃতার্থ হন। দোকানদার ভিন্ন দেশেরও আছে। এক ভারতীয় নারী, দেখি, চালাঘরে কাঁচের চুড়ি ও ধূপকাঠির দোকান দিয়েছেন। বাচ্চা মেয়ে—তাঁর নিজের মেয়ে বলে মনে হয়—খদ্দের ঠেকাচ্ছে।

হিমানীশকে* বলি, ছবি নিতে পার তো বলি বাহাদুর। দেখতে পেলে কিন্তু ছবি নিতে দেবে না। চেঁচাবে।

দুনিয়ার হেন বস্তু নেই, এখানে যা না দেখছি। খদ্দেরের বেজায় ভিড়। নানান দেশি মানুষ।

এক দরজার পাশে ধূলোর উপর তিন ব্যক্তি উবু হয়ে বসে। মাথায় ফেজটুপি, পরনে লুঙি, পায়ে দেশি-মুচির জুতো। কী ভাল যে লাগল! হোক ইস্ট-এণ্ড—তবু খাস লণ্ডন শহরের মধ্যেই। হেন স্থানে ওদের পেয়ে যাব ভাবতে পারি নি।

মিঞা সাহেবের নিবাস?

নোয়াখালি জিলায়।

কদ্দিন এসেছেন লণ্ডনে?

---

* লেখক ও কার্টুনিস্ট হিমানীশ গোস্বামী

চোখ ঠারাঠারি করছে [illegible] ভাব। তখন অধিক ঘনিষ্ঠতা করবার জন্য বিগলিত কণ্ঠে বলি, আমারও বাড়ি আপনাদের দেশে। লণ্ডনে নতুন এসেছেন বুঝি? আছেন কোথায়?

জাহাজে আছি। কেনাকাটা সেরে আবার জাহাজে ফিরে যাব।

কোথায় জাহাজ?

বন্দরে আছে, আবার কোথায়?

খিঁচিয়ে উঠল তারা। অবাক হলাম। বিড়বিড় করে আরও কি সব বলতে বলতে গলিতে ঢুকে পড়ল।

হিমানীশকে বলি, রোদ চড়ে যাচ্ছে, যাওয়া যাক। ধুপের দোকানের ফোটো নিয়ে নাও, যদি পেরে ওঠো।

হিমানীশ বলেন, ফোটো তোলা কখন হয়ে গেছে।

বিশ্বাস হয় নি। সর্বক্ষণ পাশে পাশে—আমি কি তবে কিছু জানতে পেতাম না? কিন্তু তুলেছিলেন ঠিকই—পরে একদিন কপি দিলেন।

ইতিমধ্যে এক চোস্ত পোশাকের সাহেব এসে ইতিউতি তাকাচ্ছেন। চেহারায় যাই হোন, পোশাকের খাতিরে ইংরেজিতে বলছি, তিনটে লোক ছিল এখানে, তাদের খুঁজছেন বোধহয়?

তিনিও শুরু করলেন ইংরেজিতে। কিন্তু ইয়েস অবধি বলে আর বিশেষ সুবিধা হল না। স্বভাষায় বললেন, গেল কোথা হতভাগারা?

গলিতে ঢুকেছে। আপনিও বুঝি নোয়াখালির লোক?

কটমট চোখে চেয়ে ভালমন্দ কোন জবাব না দিয়ে তিনিও নিষ্ক্রান্ত হলেন। দোষঘাট কি হচ্ছে জানি নে—সবাই এমন করে কেন?

রহস্য পরে জানলাম। ওকিবহাল একজন সমাধান করে দিলেন। যেচে ভাব করতে যাওয়ায় আমাকে ওরা চর ঠাউরেছে। ঐ তিনজন জাহাজ-পালানো লোক সম্ভবত। এবং পরের মানুষটি দালাল। মজুরের বিস্তর চাহিদা ওদেশে। ওদেরই চাচা-দাদারা কলে খাটছে, তারা চিঠি লিখেছে: চলে আয়। জাহাজের লস্কর

হয়ে নিখরচায় চলে এসেছে। বন্দরে ছুটি পেয়েই ফৌত। দালালে লুকিয়ে থাকে—লুফে নিয়ে ওয়েলসে কিংবা আর কোন দূরপ্রান্তে সঙ্গে সঙ্গে চালান দেয়। জাহাজ থেকেও খোঁজখবর করে ধরবার জন্য। রীত-রক্ষার মতো ব্যাপার—জাহাজের কর্তার জানে, বাইরের চার গুণ তলব ছেড়ে দরিয়ার উপরে মানুষ কয়লা ঠেলে মরতে যাবে কেন? টাকা পাঠানোর কিছুমাত্র অসুবিধা নেই—জাহাজ ভাইব্রাদার কত রয়েছে, তা ছাড়া চাচা-দাদারা টাকা পাঠাচ্ছে সেই সঙ্গেও পাঠানো যায়।

আর কপালে থাকল তো মেমসাহেব জুটিয়ে এখানেই ঘরকন্না জুড়ে দিল। ভোটারের লিস্টে নেলি সর্দার, ডরোথি বিশ্বাস বিস্তর এমনি নাম পাবেন। বিশ বছর ঘর করছে—বিবিজান ককনি চালাচ্ছে, মিঞাসাহেব সিলেট-নোয়াখালির বাংলা। কথা না বুঝেও ঘরসংসারে বিন্দুমাত্র অসুবিধা নেই। মূর্খ-বিজ্ঞ কত জনে আমাদের রুজিরোজগার করে খাচ্ছে, দিনকতক লণ্ডন শহরে চক্কোর দিয়ে বেড়ালে তবে মালুম হবে।

স্বাধীন ব্যবসাই বা কত! একটার ভারি চল—হোটেলের ব্যবসা। ঢাকা-রেস্তোরাঁ, বোম্বাই রেস্তোরাঁ—পদে পদে দেখতে পাবেন। দিনকে-দিন বেড়েই চলেছে। খদ্দেরের বিস্তর ভিড়, সাদা মানুষের—দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না। বাংলা কথাবার্তায় একদিন মালিকের সঙ্গে জমিয়ে নিলাম: ব্যাপার কি বলুন তো—কেনে লোভ এত এসে জমে? মালিক বলে কী জানি মশায়! ঠেসে তো ঝাললঙ্কা দিই—খেতে খেতে সাহেব-মেমের চোখে জল বেরিয়ে আসে। তাইতে যেন বেশি মজা পেয়ে যায়। একদিন খেয়ে গেল—পরের দিন দেখি, সেই মানুষই এসেছে নতুন এক গণ্ডা সঙ্গে জুটিয়ে। ভারত কিম্বা পূর্ব-অঞ্চলে কোন সূত্রে যারা একবার-দু'বার গিয়েছে তাদের তো টিকি বাঁধা এই সব হোটেল।

সব ভাল, একটা ব্যাপারে কেবল মুসড়ে যাই। অভিমানে আঘাত লাগে। দেশভুঁয়ে আপনারা কালো বলে তাচ্ছিল্য করেন—ইয়োরোপের দেশে দেশে সেই কালোর দেমাকে এতাবৎ ধরাকে সরার তুল্য গণ্য করে এসেছি। হ্যাঁ, সত্যি কথা। রাস্তায় বেরুলে দূরের মানুষ দ্রুতপায়ে কাছে চলে আসে একটি নজর দেখবার আশায়। ট্রামে যাচ্ছি, দেখি সবগুলো দৃষ্টি আমার দিকে। কেউ সোজাসুজি তাকাচ্ছে, ভদ্রতা বজায় রেখে কেউ-বা আড়চোখে। গোড়ায় ঘাবড়ে যেতাম—কী আজব চিজ লোকে দেখে এমন করে! শেষটা একজনে বাতলে দিলেন—ঘৃণা-বিদ্বেষ নয়, নয়নে ওদের বিস্ময়। এবং লোভও কিঞ্চিৎ। আকুল হয়ে কালো রূপ দেখে। গায়ের সাদা রং এতটুকু বাদামি করবার জন্য কড়া রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকে, এটা-ওটা মাখে। ফর্শা হবার জন্য আমাদের দেশে গায়ের চামড়া ঘষে ঘষে অর্ধেক তুলে ফেলে, দেখেন না? তারই উল্টো আর কি!

তখন বুক চিতিয়ে রূপ দেখিয়ে বেড়াই—দু-চোখ ভরে দেখ সকলে এবং ঈর্ষ্যায় জ্বলে পুড়ে মরো। কিন্তু লণ্ডনে এসে সকল দর্প ভাঙল। কালো মানুষ আমার মতন হাজার হাজার—কে কার খবর রাখে! তা ছাড়া ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ ও আফ্রিকার ভায়ারা আছেন—কৃষ্ণাঙ্গের দাপটে সকলকে নস্যাৎ করে পথে-ঘাটে অবাধ বিচরণ। আর গৌরাঙ্গিণীরা ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্চে তাঁদের চতুর্দিকে। জামাইকা তো বারোআনা লণ্ডন-নন্দিনীর শ্বশুর-বাড়ি হতে চলল। এই নিয়ে ভাবনা ঢুকে গেছে কর্তাদের। অথচ মুখ ফুটে বলবারও জো নেই। হারাধনের দশটি ছেলের সমস্ত মরে হেজে গিয়ে বাকি এখন ঐ একটা-দুটো কলোনি। আহারে বিহারে দেখাতে হচ্ছে সকলে এক সমান। এ বাজারে নয় তো বিগড়ে উঠতে কতক্ষণ। ঐ মহাশয়দের পাশে আমা হেন ব্যক্তিও ফর্শা বলে অবহেলার পাত্র। আমার এখানে খাতির হবে কিসে?

সভাপর্ব

১

সভার ব্যাপারে দিনকে-দিন নানান পদ সৃষ্টি হচ্ছে। সভাপতি তো বটেই, পরের পদ প্রধান-অতিথি। আর একটা হল উদ্বোধক। তা ছাড়া অনুষ্ঠান ভেদে আরও নানা পদযোজনা হয়। নামী লোক কেউ পদ বিনে সভায় আসেন না। খাতিরে পড়ে হয়তো কথা দিলেন, সময় কালে পাত্তা মেলে না। ভেবে ভেবে সেজন্য পদ বের করতে হয়।

তিন পদের মধ্যে উদ্বোধক পদটাই বেশি পছন্দ আমার। উদ্বোধকের বক্তৃতা সকলের আগে। উৎসাহ ভরে মানুষ ভিড় করেছে, দেহ ও মনে প্রচুর তাগত—এমনি অবস্থায় যথেচ্ছ বক্তৃতার মুশলাঘাত করা চলে। করেই ছুটি। তারপরে ইচ্ছে হল তো সভাস্থলেই বসে বসে শ্রোতৃমণ্ডলীর দুর্গতিতে বিমল আনন্দ-রসাস্বাদন করুন। বেরিয়ে এসে প্রাকৃতিক শোভা দেখেও বেড়াতে পারেন। কিম্বা কাজের অজুহাত দেখিয়ে সরাসরি বাড়ি গিয়ে শয্যার আশ্রয় নিন।

শেষ পন্থায় কিছু মুশকিল আছে। আসবার সময় গাড়ি খরচা করে পরম যত্নে তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন, যাবার মুখে হয়তো বা শুধুমাত্র গাড়ি ডেকে দেবার লোকই মিলবে না। যেন ফৌজদারি মামলার সাক্ষি। সাক্ষি যতক্ষণ না কাঠগড়ায় উঠছে, খাতিরযত্নের অবধি নেই। যা বলছে তাতেই 'হ্যাঁ'। চড়া রোদ্দুরে কর্তামশায়, ছাতার অভাবে বড় কষ্ট হচ্ছে। কর্তামশায় এখন কল্পতরু: তার জন্যে কি—দেবো কিনে ফ্যান্সি সিল্কের ছাতা। কোর্টে পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাবে, নয়তো এখনই কিনে দিতাম।

ফেরার সময়টা মনে কোরো। ফেরার পথে কর্তামশায়কে দিয়েছে সে মনে করিয়ে। তখন ভিন্ন সুর : ঐ তো কত সব দোকান রয়েছে, টাকা ফেলে পছন্দ মতন নাওগে কিনে ছাতা। আমাদেরও কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ রকম ছাতা কেনার অবস্থা। বক্তৃতা সমাধা হবার সঙ্গে সঙ্গে পট-পরিবর্তন—শত প্রশ্নে তখন ভালমতো একটা জবাব মেলে না।

উদ্বোধক হয়ে একবার কী বিপদে পড়েছিলাম, বলি। তারিখ আঠাশে-উনত্রিশে বৈশাখ, জায়গা কলকাতার কাছাকাছি। অনুষ্ঠান সম্পর্কে আগে ওঁরা কী সব বলেছিলেন, ভুলে গেছি। ছাপানো চিঠিও এসে থাকবে, হারিয়ে গেছে। সভাক্ষেত্রে উঠে দাঁড়ালাম উদ্বোধন করতে। বৈশাখের শেষ, অতএব রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকী না হয়ে যায় না। তদনুযায়ী রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পড়েছি। বক্তৃতা ঝরঝর করে এগুচ্ছে, উদ্যোক্তারা দেখি মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। শেষকালে একজন উঠে এসে কানে কানে বললেন, রবীন্দ্রজয়ন্তী নয়, নববর্ষ-আবাহন।

রসভঙ্গে আগুন হয়ে উঠেছি আমি : বৈশাখের শেষে কোন্-দেশি নববর্ষ মশায়? সে হবে না, রবীন্দ্র-জয়ন্তী চালাব।

সকাতরে ভদ্রলোক পুনশ্চ বলেন, ক্ষমাঘেন্না করে নিন স্যার, আমাদের মধ্যে দলাদলি মেটাতে এত দেরি হয়ে গেছে। কী করা যায় তখন! ঈশানের পুঞ্জ মেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে আসে বাধাবন্ধ হারা—'বর্ষশেষ' কবিতার খানিকটা আবৃত্তি করে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর পাশ কাটিয়ে নববর্ষ-বন্দনায় মোড় নিতে হল।

কে সভাপতি কোন্ জন প্রধান-অতিথি আগে থাকতে এসব কথাবার্তা হয়ে আছে। কার্ডে নাম ছাপা। তা সত্ত্বেও একজনে উঠে নাম প্রস্তাব করবেন, অন্যে সমর্থন করবেন। রীতকর্মটুকু সমাধা না হওয়া পর্যন্ত নিচের আসনে বসে আছি আমরা। পদ

পাকা হয়ে গেলে মাতব্বররা সঙ্গে করে নিয়ে যথাযোগ্য স্থানে বসিয়ে দিচ্ছেন। ছাতনাতলায় বর নিয়ে বসানোর মতন। ফুটফুটে চেহারার এক বাচ্চা ধরে আনা হল মাল্যদানের জন্য। এক একটা গলায় মালা পড়ছে, আর চটাপট হাততালি। নিয়ম হল, মালা তৎক্ষণাৎ খুলে ফেলতে হবে, মালার সঙ্গে গলদেশের আর কোন যোগাযোগ নেই। ইতিমধ্যে এক মাতব্বর প্রোগ্রাম নিয়ে সভাপতির সামনে দিয়েছেন। যাক বাবা, বক্তা দেখা যাচ্ছে পাঁচজন। কায়ক্লেশে ছুটো ঘণ্টা কাবার করতে পারলেই সভাপতির পালা এসে যাবে। বক্তারা একের পর এক উঠছেন—সভাপতি ততক্ষণ ভেবে নিচ্ছেন, তাঁর অভিভাষণ কোন কায়দায় শুরু করবেন। এবং উপসংহারই বা কোন কথার উপর হবে, যাতে প্রচণ্ডতম হাততালি আদায় করা যায়।

কী সর্বনাশ—একটি বক্তার হয়ে গেল তো মাতব্বরমশায় প্রোগ্রামে নিচে ছুটে-তিনটে নতুন নাম বসিয়ে দিয়ে গেলেন। দীনবন্ধু-দাদার দধিভাণ্ড আর কি। ভাণ্ড যতই উপুড় করুন, দধি আর শেষ হয় না। কার পরে কে বলবেন, সেটাও সেই মাতব্বরমশায় বলে দিচ্ছেন। সভাপতির কাজ শুধু করুণ মুখে শেষ সময়ের প্রতীক্ষা করা, সকলের যাবতীয় কথা যখন শেষ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে উঠে গিয়ে একটান সিগারেট টেনে আসবেন, সে উপায় নেই। কোমরে ফিক ধরলেও একবার নড়ে বসতে দেবে না। প্রাচীন গানে মৃত্যুসময়ের ভয়ঙ্কর অবস্থার বর্ণনা আছে, তারই একটা কলি সেই সময়ে ঘুরে ফিরে মনে আসে—"অন্তে বাক্য কবে তুমি রবে নিরুত্তর।" রামমোহন রায়ের রচনা। তিনিও নিশ্চয় অনেক সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। নয়তো কলমের ডগায় এমন মোক্ষম বাক্য সম্ভবে না।

আরও যে কত রকমের বিপদ সভাপতিত্ব করতে গিয়ে!

শুনবেন? এক গণ্ডগ্রামে নিয়ে গেছে, ছোঁড়াদের কী এক সাংস্কৃতিক সভা। ভোরের আগে ট্রেন নেই, রাতটুকু কাটিয়ে আসতে হবে। এক ছোকরা নিতে এসেছে। বলে, স্টেশনের উপর দোতলা হরিসভার বাড়ি, ফুরফুরে হাওয়া, তোফা থাকবেন। অতএব মাঝারি গোছের বেডিং ও স্যুটকেশ সঙ্গে নিতে হল।

স্টেশনে নেমে কুলি পাইনে। ছোকরা বলে, গাঁয়ের ডেলি-প্যাসেঞ্জার, শক্তসমর্থ মানুষ সবাই—কুলির তোয়াক্কা রাখিনে আমরা। স্টেশন ছেড়ে যত কুলি খাদের কাজে নেমে গেছে।

বেডিংটা সে নিয়ে নিল—প্রথমে বগলে, পরে কাঁধে, সর্বশেষ মাথায়। স্যুটকেশ আমি নিয়েছি। ওটাও মাথায় তুললে সুবিধা হত। কিন্তু সভাপতি মানুষের ইজ্জত বিবেচনা করে প্রাণপণে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছি। চলেছি তো চলেইছি।

কী ভায়া, বললে যে স্টেশনের উপর—

ছোঁড়া খিঁচিয়ে উঠল : স্টেশনের উপর মানে কি প্ল্যাটফরমের উপর?

সন্ধ্যা হয়-হয়। এক সময় অবশেষে হরিসভার বারাণ্ডায় ধপাস করে সে বেডিং নিয়ে ফেলল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। বাড়ি দোতলাই বটে, কিন্তু সামনের দরজায় ভারী তালা ঝুলছে।

বসুন আপনি—বেডিং-এর উপরেই চেপে বসুন না। দেখে আসি, ঘর খোলার কী করা যায়।

গেল তো গেল। ঘোর হয়ে গেছে। ঠায় বসে আছি সেই একটা জায়গায় ধূলোপায়ে। জনমানব দেখিনে যে জিজ্ঞাসা করে নেবো হাত-পা ধোবার পুকুরঘাট কোন্ দিকে। নিজে খোঁজ করব —কিন্তু জায়গাটা যেন কেমন-কেমন, জিনিসপত্র ফেলে বেরুতে ভরসা হয় না। সেই ফাঁকে হয়তো বা লোপাট হয়ে যাবে।

আওয়াজ পাচ্ছি, কলকাতার গাড়ি এলো একটা। রাস্তার

উপরে এতক্ষণে মানুষের চলাচল। ডেলি-প্যাসেঞ্জাররা বাড়ি ফিরছেন। ডাকাডাকিতে একজন এসে কম্পাউণ্ডে ঢুকলেন।

কে আপনি মশায়? এখানে কী জন্য বসে?

সভায় নিয়ে এসেছে। তাদের কারও পাত্তা পাচ্ছি নে।

ছেলেছোকরার কাণ্ড! বোধহয় ভুলে গেছে।

আপনি যদি একটু মনে করিয়ে দিয়ে আসেন দয়া করে।

দূর মশায়। খেটেখুটে এলাম, কোথায় কাকে এখন খুঁজে বেড়াই! কে নিয়ে এসেছে, নামটাও তো সঠিক বলতে পারছেন না।

পরক্ষণে সান্ত্বনা দেন: থাকুন না বসে। জলে পড়েন নি। গাড়িভাড়া দিয়ে নিয়ে এসেছে, ঠিক একসময় মনে পড়ে যাবে।

তিনি সরে পড়লেন। তারপর আরও সব আসছেন। কয়েকজন করুণাপরায়ণ। চুক-চুক করে বলেন, ছোঁড়াগুলোর কাণ্ডই এইরকম। আপনাকেও বলি মশায়। ওরা নাচিয়ে দিল, অমনি নেচে উঠলেন? গিয়ে তো গাঁয়ের নিন্দে করবেন—গ্রামবাসী আমাদেরই যত জ্বালা।

আমি ঘাড় নেড়ে বলি, কিচ্ছু না, শতমুখে প্রশংসা করব, সাড়ে-আটটার ট্রেনে যাতে কলকাতা ফিরতে পারি সেই উপায় করে দিন। একটা লোক দেখে দিন মালগুলো যে স্টেশনে দিয়ে আসবে।

ভদ্রলোক শিউরে ওঠেন: রক্ষে করুন। মারা যাই আর কি আপনার কথা শুনে! আপনি তো গাড়ি চেপে সড়াৎ করে বেরিয়ে পড়লেন। জানাজানি হতে বাকি থাকবে না—সভাপতিকে সরিয়ে যজ্ঞি নষ্ট করেছি। সকালসন্ধ্যা স্টেশনের পথে যেতে হয়, পথের উপর চায়ের দোকানে ওদের আড্ডা। ইট মেরে মাথা ফাটিয়ে দিলে আপনি কি তখন ঠেকাতে আসবেন? তার চেয়ে চা এনে দিচ্ছি—চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে বসুন।

সত্যি, করুণার অন্ত নেই। কেটলি ও মাটির ভাঁড় নিয়ে এলেন সেই কোন চায়ের দোকান থেকে। অতিরিক্ত একখানা লেড়ো-বিস্কুট। ঈশ্বর এঁদের শতায়ু করুন। তারপরেও নিজেদের মধ্যে বলাবলি হচ্ছে: শোবেন কোথা সভাপতিমশায়—বারাণ্ডার উপরে? খাবেন কি?

এক ময়রা আছে বুঝি, তাকে লুচি ভাজবার ফরমাস দিলে সভাপতিকে উপবাসে নিশিযাপন করতে হয় না। লুচি আর আলু-কুমড়োর তরকারি। কিন্তু যা করতে হয়, এখনই। দোকান বন্ধ করে ময়রা বাড়ি চলে গেলে আর হবে না।

ফিসফিস-গুজগুজ চলছে। লুচির মূল্যটা কে দেয়, সেই কথা। চাঁদা তোলার কথা উঠছে, তা-ও বুঝতে পারি। ক্রুদ্ধ একজন ওঁদের মধ্যে বলে উঠলেন, মাতব্বরি করে ছোঁড়ারা নিয়ে এলো, আমরা কেন গচ্চা দিয়ে মরব?

আমি একটা টাকা বের করে দিলাম: ময়রাকে দিন গিয়ে। লুচিভাজা হলেই নিয়ে আসবে, গরম গরম খেয়ে নেবো।

সভার উদ্যোক্তারা অনতিপরেই এসে উপস্থিত। যে ছোকরা আমায় বসিয়ে রেখে চাবি খোলার ব্যবস্থায় গিয়েছিল, সে-ও এসেছে।

মীটিঙে আসুন।

রাত আটটার সময় মীটিং আবার কী?

ছোকরা বলে, ভারি লজ্জার ব্যাপার। হরিসভার চাবি যাঁর কাছে, তিনি কলকাতায় গিয়ে বসে আছেন। তাঁর খোঁজে দেরি হল। তার উপর দুটো দল হয়ে গেছে আমাদের। সাবজেক্ট কমিটীতে মারামারি ব্যাপার। অনেক কষ্টে এতক্ষণে খানিকটা মিটমাট হয়েছে।

না ভাই শরীর ভেঙে পড়ছে। যা হোক কিছু মুখে দিয়ে আমি শুয়ে পড়ব।

ও-পক্ষের স্বর ক্রমশ উষ্ণ হয়ে হয়ে উঠছে: শুয়ে পড়বেন মানে? সভাপতি বিনে মীটিং হয় কখনো?

বারাণ্ডার উপর সেই তো শিবস্থাপনা করে চলে গেলেন। সভাপতির কি গতি হল, এতক্ষণের মধ্যে খোঁজ নিয়েছেন একবার?

ছোকরা অধীর ভাবে বলে, বললাম তো অন্যায় হয়েছে। এক কথা কতবার বলতে হবে! খাতিরযত্ন করে অদ্দূর থেকে নিয়ে এলাম, আপনি বলছেন শুয়ে পড়বেন। চার গাঁয়ের মানুষ জড় হয়েছে, তাদের সামনে চুন-কালি দেবেন আমাদের মুখে। বেশ, দেখুন তবে সেই চেষ্টা করে। আমরাও দেখব।

মেজাজ বুঝে সুড়সুড় করে চললাম। দু'টি ছেলে—ভলণ্টিয়ার হবে তারা—স্যুটকেশ ও বেডিং ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে চলল।

যায় কোথা ওরা?

তুলে পেড়ে রাখছে। ঘর খোলা গেল না, এইখানে ফাঁকায় শোবেন। ফুরফুরে হাওয়া। মীটিং হয়ে গেলে ওরাই এসে যত্ন করে বিছানা পেতে দিয়ে যাবে।

লুচির অর্ডার দিয়ে সেই ভদ্রলোক ইতিমধ্যে ফিরে এসেছেন। বললেন, লুচি ঠাণ্ডা হলে কিন্তু চামড়ার মতন হবে, টেনে ছিঁড়তে পারবেন না। তার চেয়ে খেয়েদেয়ে কায়েমি হয়ে মীটিঙে বসুনগে।

সেই লোভে নিমেষকাল বোধহয় থমকে দাঁড়িয়েছি। অমনি হুঙ্কার: বাগড়া দেন কী জন্যে? লুচি খেতে তো আসেন নি। কী দরের মানুষ! লুচি কলকাতায় ঢের ঢের খেয়ে থাকেন। কি বলেন সার?

ঘাড় নেড়ে তৎক্ষণাৎ সকাতরে সায় দিই।

কত লোক আশা করে এসেছে। নমো-নমো করে সেরে ফলারে এসে বসবেন—সেটা কিন্তু হবে না সার।

চিঁচিঁ করে বলি, তা কেন হবে?

প্রীত হয়ে ছোকরা বলে, দেশের এই দুর্দশা—বক্তৃতাটা জ্বালাময়ী হয় যেন। দেখবেন কী হাততালি!

আরও আছে। পরের দিন সকালবেলা।

ওদের বলেছিলাম, যা হবার হল—সকালের পয়লা ট্রেন ধরিয়ে দিতে হবে কিন্তু।

আলবৎ। তার আগে ব্রেকফাস্ট। চায়ের দোকানটা বলতে গেলে আমাদেরই। তারা ব্যবস্থা করেছে। আজকের যত-কিছু খুঁত ঐ এক খাওয়াতে পুষিয়ে দেবে। কী পেল্লায় ব্যাপার দেখবেন।

রোদ উঠে যায়, চোখ মুছতে মুছতে ভলন্টিয়ার একটি এলো।

চলুন। কাল যা ধকলটা গেল, ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে। ছুটে চলুন, স্টেশনে গাড়ি এসে পড়ল বোধহয়।

আজকে উল্টো। সে নিয়েছে স্যুটকেশ, আমি বিছানা। বিছানা মাথায় চাপিয়ে নিলাম। দেখুকগে লোকে, বয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে কোন রকমে কামরাতেও ওঠা গেল। গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে।

প্ল্যাটফরম থেকে বলে, টিকিট করা হয়নি কিন্তু সার।

তবে?

ভয় কিসের? টিকিটবাবু টিকিট চাইলে হাতে একটা আধুলি গুঁজে বেরিয়ে যাবেন। এই তো রেওয়াজ। হরদম করছি আমরা।

কিন্তু কাপুরুষ আমি, বহুপরীক্ষিত পন্থা নিতে সাহসে কুলায় না। পরের স্টেশনে গার্ডকে বলে ন্যায্য ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। এতক্ষণে সোয়াস্তির নিশ্বাস পড়ে—এ-যাত্রার ফাঁড়াটা বোধহয় কাটল।

এসব অনেক দিনের কথা। এ লাইনে নবীন আগন্তুক তখন। আবার ঝানু সভাপতিও আছেন—সামাল দিতে উদ্যোক্তারা নাকের-জলে চোখের-জলে হন। এক সভাপতির তুষ্টির জন্য টালিগঞ্জ থেকে দু-গাড়ি বাঁশ কিনে পাঠাতে হয়েছিল।

(২)

সভাপতিকে খপ্পরে এনে ফেলেই কর্মকর্তাদের মনমেজাজ আলাদা হয়ে যায়। সংখ্যায় এঁরাই বেশি। এতক্ষণ আমি এঁদেরই দু-পাঁচটা বৃত্তান্ত বলেছি—কিন্তু ধুরন্ধর সভাপতিও আছেন, যাঁদের সামলাতে উদ্যোক্তারা চোখে সর্ষেফুল দেখেন। এমনি একজনের কথা কালিদাস রায় মশায়ের মুখে শুনেছি। কালী-দা কত সুন্দর করে বলেন, অধম শুধুমাত্র ঘটনা বলে খালাস।

খ্যাতিমান ব্যক্তি—নইলে আর সভায় ডাকবে কেন? নাম অতএব উহ্য রইল। গোঁফ ওঠার আগে থেকেই সভা করে করে এই কর্মে ঝানু হয়ে আছেন। উদ্যোক্তা যত ঘড়েলই হন, এই ব্যক্তির সঙ্গে চালাকি খাটে না।

সভায় যেতে হবে অমুক খানে।

বেশ তো! কিসের সভা, আর কে কে যাচ্ছেন? ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসে সভাপতি গাঁথা যায় না। বোসো তুমি, শোনা যাক। জায়গাটা কেমন, বলো দিকি শুনি।

জেরা করে করে যাবতীয় খবর টেনে বের করছেন। অকুস্থলের যাবতীয় ভূগোলবৃত্তান্ত। যথা, সেই জায়গায় গমনাগমনের পথ, মানুষজন, উৎপন্নদ্রব্যাদি। শেষ বিবরণটা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে।

বলেন, কাঁচাগোল্লাটা করে ভাল তোমাদের ওখানে। বড্ড নাম। ভালই হল, ছোট জামাই আসছে ঐ সময়টা। পাঁচ সের কাঁচাগোল্লার অর্ডার দিয়ে রেখো, নিয়ে আসব। কেষ্টবিষ্টু তোমরা সব ওখানকার, তোমাদের কথায় সবচেয়ে সরেস জিনিস বানিয়ে দেবে। আমরা কিনতে গেলে তা হবে না। কী রকম দাম?

জিভ কেটে সেই কর্মকর্তা বলেন, আজ্ঞে দামের কথা বলে

লজ্জা দেবেন না। আপনি হেন দিক্‌পাল মানুষ পদধূলি দিয়ে গ্রাম ধন্য করছেন, তার দামটাও তবে তো হিসাব করতে হয়।

সভাপতি গম্ভীর হয়ে যান: দাম না নিলে আনব না তোমাদের জিনিস। আমার স্পষ্ট কথা। অভদ্রতা হবে, কিন্তু নিরুপায়। তোমাদের ওখানে যাওয়াই চলবে কিনা, আর একবার ভেবে দেখতে হবে।

অনেক করে তখন ঠাণ্ডা করতে হয়: দাম তো রোজ একরকম থাকে না। ছানার বাজার অনুযায়ী দর ওঠানামা করে। গিয়েই গোল্লার অর্ডার দিইগে, দিনের দিন দামের কথা বলব।

কিন্তু বহুদর্শী মানুষ উনি সুনিশ্চিত জানেন, অর্ডার দেবে না কভু। কষে তাগিদ করলে বাজার থেকে কিনে দেবে শেষ মুহূর্তে। তারাও জানে, কাঁচাগোল্লার যখন ঝোঁক উঠেছে, না দিয়ে এ লোকের কাছে অব্যাহতি নেই। দরদাম সমস্ত হবে—কিন্তু বিদায় হওয়ার সময় হুড়োহুড়ির মধ্যে টাকা দিতে বেমালুম ভুলে যাবেন তিনি। এ সমস্ত বলতে হয় বাইরের লোকের কাছে পশার বাড়াবার জন্যে।

আর একবার। অজ-পাড়াগাঁয়ে সভা—খবর নিয়েছেন, মিষ্টান্ন বা শিল্পদ্রব্য কিছুই মেলে না সেখানে। যেতে হল নিতান্ত খাতিরে পড়ে। ঐ কালী-দার অনুরোধে, উদ্যোক্তারা কালী-দার বিশেষ প্রীতিভাজন।

সভাস্থলে নিয়ে বসাল। জংলি জায়গা। ঝাঁটপাট দিয়ে বাঁশের পাতা স্তূপাকার করে রেখেছে একদিকে। চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে সভাপতির বিরস মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সহসা: বাঃ বাঃ, খাসা গ্রামখানা তোমাদের। ছবির মতো। ছায়াশীতল বেণুবনে সভার জায়গা—রুচির তারিফ করি।

কর্মকর্তা লোকটা কৃতকৃতার্থ হয়ে বলে, আজ্ঞে, বড্ড বাঁশব:
এখানে। সেজন্য লোকের জ্বরজারি ছাড়ায় না।

কিন্তু সাহিত্যিক সভাপতির জনস্বাস্থ্য নিয়ে কী মাথাব্যথা
নিজের কথা বলে চলেছেন, আর দেখ, বালিগঞ্জ জায়গায় আি
তিন কুঠুরি দালান দিচ্ছি—ভারার বাঁশ কিনতে কিনতেই ফতু:
হয়ে গেলাম। তোমাদের কেমন সুবিধা—ঝাড়ের বাঁশ কিনতে
হয় না, যত খুশি দালান দিয়ে যাও।

চতুর্দিকে আর একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে বললেন, দিও বাবাজি
আমার জন্যে দু-গাড়ি বাঁশ পাঠিয়ে। নিখরচার জিনিস, তাই
বলছি। চোখ বুঁজবার আগে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিজের ঘরবাড়িতে
বসবাস করে যাবো।

মনে যাই থাক, রাজি না হয়ে উপায় কি ? একেবারে মোক্ষ:
সময়ে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন। মানুষজন পিলপিল করে এসে
জমছে। উদ্বোধন-সঙ্গীতের হারমোনিয়াম এনে টেবিলের উপ:
ফেলল। এই সময়টা সভাপতি বিগড়ালে দশখানা গাঁয়ের মধে
মুখ দেখানো ভার হয়ে উঠবে। ঘাড় নেড়ে তাড়াতাড়ি সে বলে
আজ্ঞে হ্যাঁ, দেবো তাই—

আজামোজা কথায় সভাপতি তুষ্ট নন। বলেন, কী দেবে ?

বাঁশ।

কবে দেবে সেটাও ঠিক করে বলো। মানে, আমার কেনা
কাটা সারা, সেই সময় তোমাদের বাঁশের গাড়ি পৌঁছল—সে
জিনিস আমার কোন্ কাজে লাগবে ? আজকে গেল রবিবার—
কাল সোমবারের মধ্যে বাঁশ-কাটা গাড়ির বন্দোবস্ত করা—সমস্ত
সেরে রাখবে। আচ্ছা, আরও একটা দিন হাতে দিচ্ছি। বুধবারে
বাঁশ কিন্তু আমার চাই-ই।

লোকটা অধৈর্য হয়ে বলে, পেয়ে যাবেন তাই। প্রস্তাব আর
সমর্থন দুটোই হয়ে গেছে—বেঞ্চি ছেড়ে এবারে আপনি সভাপতির

আসনে গিয়ে বসুন। মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মানুষজন ব্যস্ত হয়ে পড়ছে।

আসনে বসবার তবু এখনো-সামান্য-কিছু বাকি। ক্ষণস্থায়ী পুষ্পমাল্যের চেয়ে বাঁশ বেশি মূল্যবান। বললেন, এই তবে কথা রইল। নামটি কী তোমার বাবা? এসব বারোয়ারি কাজে এক-জনের উপরে ভার দিয়ে রাখতে হয়। না পেলে তোমাকেই ধরব।

একগাল হেসে বললেন, হাজার খানেক সভাপতিত্ব হয়ে গেছে, প্রাণে বেঁচে থাকলে কোন না আরও হাজার খানেক হবে। পরখ করে দেখেছি, কথাবার্তাগুলো আগে হয়ে থাকলে বক্তৃতা জমে ভাল।

কথাবার্তা পাকা করে সভাপতি তড়াক করে গদির চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আর কোন বাধা নেই, পুরো দমে চলল সভা।

অন্তরঙ্গদের কাছে বলতেন, আমি লজ্জা করি নে। লাজুক বামুন আর কেশো চোরের কিছু হয় না। চোর যদি সিঁধে ঢুকে কাশতে শুরু করে আর বামুন যদি পাওনাগণ্ডার মুখে লজ্জায় চুপ করে থাকে, নির্ঘাৎ তারা ফাঁকিতে পড়বে।

সভা শেষ করে বালিগঞ্জে ফিরলেন, বাঁশ আর আসে না। নিয়মও তাই—সভা অন্তে সভাপতিকে এবং ফৌজদারি-মামলার ক্ষেত্রে এজলাস থেকে বেরুনোর পর সাক্ষিকে মক্কেল চিনতে পারে না। এখানে ভিন্ন ব্যাপার। কালিদাস রায় মশায় মধ্যবর্তী। তাঁরই কথার উপর ধাপধাড়া জায়গায় সভা করতে যাওয়া—বাঁশের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত তাঁকেই ঠিক নিতে হবে।

একদিন ভাগ্যক্রমে কালী-দা'র ওখানেই সেই লোকটিকে ধরা গেল: কী গো, কত বুধবার চলে গেল—বাঁশ কোথায়? এই তোমাদের গ্রাম, এই তোমাদের কথার মূল্য—ছিঃ!

আমতা-আমতা করে এটা-ওটা বলে লোকটি আর কিছু দিন

সময় নিল। গ্রামের দশজনকে ডেকে মীটিং করেঃ এই তো ব্যাপার! বদনাম হয়ে যাচ্ছে, এর পরে আর শহরের সভাপতি জোটানো যাবে না। গাঁয়ের মানুষ ধরে ধরে সভাপতি করতে হবে।

মীটিঙের পর সেই লোক এসে কালী-দা'র কাছে বিপদ নিবেদন করেঃ বাঁশের জন্য নয়—আমাদের ও-জায়গায় বাঁশের আর ক'টা টাকা দাম! কিন্তু গাড়ি ভাড়ায় মেরে দিচ্ছে। বাঁশ নিয়ে এত দূরপথ আসতেও চায় না কেউ।

ভেবে চিন্তে এক উপায় ঠিক হল। টালিগঞ্জ পোলের নিচে বাঁশের আড়ত, নৌকোপথে নানা অঞ্চলের বাঁশ এসে পড়ে। ওর মধ্য থেকে দু-গাড়ির মতন বাছাই বাঁশ কিনে ফেল। কাঁচা দেখে দেখে কিনবে, গাঁয়ের ঝাড় থেকে যেন সদ্য কেটে আনা।

করতে হল তাই শেষ পর্যন্ত—গ্রামের প্রতিশ্রুতি এবং সভাপতির সম্মান রক্ষা হল।

উক্ত মহাশয়েরই আর এক বৃত্তান্ত। অকুস্থল বহরমপুর। ওখানকার গরদ-তসরের নাম খুব। সভাপতি সেই কথা তুললেনঃ দেখ, ক্ষেত বুঝে চাষ। তোমাদের এখানে সভাপতি হয়ে যখন সারস্বত আসরে বসব, পরনে পবিত্র গরদ থাকা উচিত। নতুনের দরকার নেই, কর্তাদের সন্ধ্যাহ্নিকে বসবার কাপড় হলেই হবে।

পাড়ার মধ্যে অবস্থাপন্ন বাড়িতেই সভাপতিকে রাখে। এঁদেরও অবস্থা ভাল, কিন্তু সন্ধ্যাহ্নিকের গরদ নেই। এ হেন অনাচারের কথা বাইরের মানুষটির কাছে প্রকাশ হতে দেওয়া যায় না। নেই বটে, কিন্তু এত বড় বাড়িতে থাকা নিশ্চয় উচিত। বাজার থেকে গরদের কাপড়-চাদর কিনে সভাপতির ঘরে কুঁচিয়ে এনে রাখল। সভাপতি ধুতি পরলেন, চাদর গলায় জড়িয়ে দিলেন। সময়টা শীতকাল বলে পশমি পাঞ্জাবি আগে

থেকে পরে এসেছিলেন, নইলে হয়তো গরদের পাঞ্জাবিও বাজার থেকে রেডি-মেড কিনে যোগান দিতে হত।

সভা বিষম জমল। এমন এক দিকপাল সভাপতি পেয়ে মফস্বল শহরের মানুষ যাঁর যতটা সাধ্য বক্তৃতার কসরত দেখাচ্ছেন। ফলে সভা যখন ভাঙল, রাত ঝাঁ-ঝাঁ করছে। বাসায় ফিরে এসেও সভাপতির জিরান নেই। সকালবেলা চলে যাবেন, নানা জনে দেখা করতে আসছে, ভক্তজনেরা এসে অটোগ্রাফ নিচ্ছে। ক্লান্ত দু-চোখ মুদে আসে, দেহ আর খাড়া রাখতে পারছেন না।

অবস্থা দেখে করুণার্দ্র হয়ে লোকজন অবশেষে ছুটি দিয়ে গেল। লুচি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তরকারি বিস্বাদ। যা হোক কিছু মুখে দিয়ে সভাপতি গড়িয়ে পড়লেন ঐ গরদ-পরা অবস্থায়। বাড়ির লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। আহা, এতদূর ক্লান্তি সভার কাপড় ছাড়বার পর্যন্ত হুশ থাকে না।

সকালে উঠে কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে রওনা। গরদের কাপড় পরাই আছে। এমন ভুলো মানুষটা—কিছুতে আর সেকথা মনে পড়ছে না। সঙ্কোচে বলাও যায় না কিছু। সাইকেল-রিক্সা এসে দাঁড়িয়েছে। যথাযোগ্য বিদায়-সম্ভাষণ অন্তে বেরিয়ে পড়লেন সত্যি সত্যি। আলনার উপর কালকের সেই চাদর ঝুলানো আছে—যাবার মুখে অন্যমনস্ক ভাবে সেটাও কাঁধে ফেলে রিক্সায় উঠে পড়লেন।

একদিন নিজেই বহরমপুরের এই গল্পটা তিনি আমাদের কাছে করলেন। বলেন, হাসছ কেন হে, লজ্জার কী আছে? গানের লোক ওরা আগাম দক্ষিণা দিয়ে নিয়ে যায়—সাহিত্যই কেবল মুফতে। চাদর না থাকে তো ডাকিস কেন রে বাপু? সময় নষ্ট হয় না আমাদের, সভার ধকলে কষ্ট হয় না? আপোসে দেবে না যখন, কায়দাকৌশল করে দোহন করে নিতে হয়। নতুন খড়খড়ে গরদ পরে শোওয়ায় কম অস্বস্তি! ঘুমই হল না ভাল করে। ভরসা

করে তবু কাপড় বদল করতে পারিনে—তক্ষুনি তা হলে বাড়ির মধ্যে চালান করে দিত!

একটা গল্প করি। নিজ অভিজ্ঞতা। অনেক দিনের কথা, পাকিস্তান হবার অনেক আগে। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এবং আমি ফাঁদে পড়ে গিয়েছি। দূর মফস্বলের মস্ত এক জমিদার-বাড়ি নিয়ে তুলেছে। ছোট তরফের অতিথি আমরা। মালিকদের যথানিয়ম কলকাতায় বসবাস, কর্মচারীরা রাজত্ব করছে। খরচ সংকুলানের মতো টাকা পাঠায় এবং চিঠিতে 'হুজুর' হুজুর' করে। মোটামুটি এতেই খুশি আছেন হুজুরগণ।

অতিথি-আপ্যায়নে কোন রকম ত্রুটি না হয়, সেজন্য কড়া নির্দেশ কলকাতা থেকে। হলঘরে অতিকায় দুটো খাট আমাদের দু-জনের। তার এক খাটেই আমাদের মতন দশটা মানুষ পাশাপাশি শুয়ে থাকতে পারে, কারো গায়ে গা ঠেকবে না। এমন গদি যে শুয়ে অস্বস্তি লাগে—মনে হবে ডুবে রয়েছি জলতলে। দু-মানুষ সমান উঁচু মশারি—ছাত থেকে পাখার রড মশারি ভেদ করে নেমে এসেছে, মশারির মধ্যেই পাখা বনবন করে ঘোরে। শোওয়ার ব্যাপারে এই।

ভোরের ট্রেনে এসে নেমেছি। চায়ের টেবিলের আয়োজন দেখেই চক্ষু কপালে উঠে যায়। বড় বড় মর্তমানকলা কমলালেবু আম আঙুর—ফলই আট-দশ রকমের। রকমারি মিষ্টিমিঠাই। সেই প্রথম বার বস্তুগুলো নেড়েচেড়ে দেখেছিলাম, তার পর থেকে ছুঁইনে। আধ-কাপ চা চেয়ে নিয়ে একখানা বিস্কুট সহযোগে গলাটা সেঁকে নিই। দুপুরে মাছ-মাংস সহ গোটা দশেক বাটি পড়ে থালার চতুর্দিক ঘিরে। একটুখানি ডাল ঢেলে নিয়ে কয়েক টুকরো আলু-ভাজা সহযোগে কোন গতিকে আমরা ক্ষুধাশান্তি করি।

মস্ত আয়োজনের সভা—তিন দিন চলবে। প্রধান-অতিথি নীহাররঞ্জন বক্তৃতা সেরে পয়লা দিনই তো কলকাতা পালালেন। পালিয়ে বাঁচলেন। সভাপতি আমার ভোগান্তি তিন দিন ধরে। একলা হয়ে আরও অসহায় বোধ করছি। উদ্যোক্তাদের একটি ছেলে মাঝে মাঝে জানতে আসেন, অসুবিধা হচ্ছে কি না কিছু। কোন কোন পদ হচ্ছে, রান্নাঘরে ঢুকে জেনে যান। বলবার কিছু নেই—রাজসূয় ব্যাপার। বলতে গেলে ভাববে, দেখছ, লোকটা কী বিশ্বনিন্দুক!

পেটের ক্ষিধেয় এদিকে চোখে আঁধার দেখছি।

মরীয়া হয়ে শেষটা মধুর হাসতে হাসতে বলি, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকব, তা নয় কলকাতা থেকে এনে বড়বাড়ির বন্দীশালায় আটকে ফেললেন। বড়লোকি ব্যাপার সব—টেবিলের উপরের আয়োজন চোখে দেখেই গা ঘুলিয়ে আসে, মুখবিবর অবধি তুলতে সাহস পাইনে। আপনাদের কারো বাড়ি নিয়ে যান, এত বড় আশ্রয় সইতে পারছি নে।

অতখানি হয়ে উঠল না, সেই দুপুরে নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর বাড়ি। যেচে নিমন্ত্রণ নেওয়া। দু-দিনের পর গৃহস্থবাড়ির চাট্টি ঝোল-ভাত খেয়ে বাঁচলাম। টেবিলে বসে গা ঘুলিয়ে আসে—কথাটা নির্জলা সত্য। আমার বিশ্বাস, কলা আম ইত্যাদি ফলপাকড় কেনা থাকে ওঁদের—পচা জিনিস পছন্দ করে সুবিধা দরে কেনা। অতিথি মুখে দিতে না পারে এমন জিনিস। টেবিল সাজানো নিয়ে কথা—খেয়ে ফেললেই আবার তো কিনতে হবে, নতুন খরচার ব্যাপার। অতিথি চলে গেলে জিনিসগুলো সম্ভবত ঝেড়ে মুছে আলমারিতে তুলে রাখবেন আগামী আগন্তুকের জন্যে। কিন্তু আহারের ব্যাপার যখন নেই, সুডৌল মাটির ফল কতকগুলো কিনলেই তো চলে। উঁহু, চলে না, উদ্দেশ্য প্রকট হয়ে যায়। এত কাঁচা লোক নন ম্যানেজারবাবু। তা হলে

পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরি করে ছুই ছেলেকে বিলেতে পড়িয়ে আনতে পারতেন না।

এই বৃত্তান্ত পাওয়া গেল এক ছোকরা কর্মচারীর কাছে। বয়স কম এবং চাকরি সামান্য বলে বই পড়া ব্যাপারটা একেবারে বাজে বলে মনে করে না। সেই সুবাদে আমাদেরও নাম জানে। এবং অবসর মতো এক আধবার সভাক্ষেত্রে গিয়ে আমাদের মুখে ভাল ভাল জবান শুনে ভক্ত হয়ে পড়েছে। ছোকরার সঙ্গে গল্পগুজব করছি একদিন, ঐ অঞ্চলের খবরাখবর নিচ্ছি। ঘড়ি দেখে উঠে পড়তে হল, সভার সময় হয়ে গেছে। ঘরে তালা দিয়ে যেতে হবে—সেই রকম নির্দেশ।

আলো তো নেভানোই আছে দিনমানে। সুইচ টিপে পাখা বন্ধ করতে যাচ্ছি, ছোকরা আড় হয়ে পড়ল: চলুক পাখা। আর যদি কিছু মনে না করেন, আলো ক'টাও জ্বেলে দিয়ে যান।

প্রস্তাব শুনে অবাক হয়ে যাই: বন্ধ ঘরের মধ্যে আলো-পাখায় লাভটা কী হবে?

মনিবের তাতে লোকসান নেই, কিছু লোকসান ম্যানেজার মশায়ের। ছুই ছেলে বিলেতে পড়িয়েছে, ছু-শ বিঘে ধানজমি আর মস্তবড় এক তালুক কিনেছে—বোতল পাঁচ-সাত কেরোসিনে সে লোকের কী আসে যায়! লোকসানটুকু ঘটিয়ে আমাদেরই তৃপ্তি। সেই জন্যে বলছি।

বৃত্তান্ত সবিস্তারে শুনি। পাখা ঘুরছে, আলো জ্বলছে—ডায়নামো চালিয়ে বাড়িতে বিদ্যুৎশক্তি বানানো। বাগানের দিক থেকে আওয়াজ আসে বটে। বাবুরা কলকাতা থেকে কালভদ্রে যখন আসেন, দিবারাত্রি ডায়নামো চলে। অন্য সময়ের নিয়ম, সন্ধ্যাবেলা আধঘণ্টা করে চলবে, অব্যবহারে যন্ত্রপাতি খারাপ না হয় সেজন্য। কিন্তু আমরা যে ক'দিন আছি—কলকাতার হুকুম,

দিনে রাত্রে যখন প্রয়োজন ডায়নামো চলবে। অতিথিপরিচর্যায় তিলেক ত্রুটি যেন না ঘটে।

ছোকরা বলে, পাখা বন্ধই থাকুক অথবা দিন-রাত চলুক—এক টিন অবধি কেরোসিন বরাদ্দ আছে, সেটা সম্পূর্ণ খরচ হবেই। ঐ ম্যানেজার রাঘববোয়ালের পেটে চলে যাবে। অত কেরোসিন না-ই খাওয়ালাম, যদ্দূর পারি খরচা হয়ে যাক।

পচা ফলেরও রহস্যোদ্ভেদ হল। কলা কমলা আম পেঁপে যাবতীয় ফলের খরচা জমাখরচে এবেলা ওবেলা লেখা পড়ছে। ছোকরা বলে, আমাদেরই লিখতে হয় ম্যানেজারের হুকুম মতো। জিজ্ঞাসা করলে আপনাকেও তো বলতে হবে, টেবিলে ছিল ঐগুলো সত্যি সত্যি। ভাল জিনিস কি বাজারে আসে না? কিন্তু সে জিনিস নিয়ে এলে খেয়ে যে দফা সারবেন। এবেলা-ওবেলা সত্যি সত্যি কিনে আনতে হবে—জমাখরচে যেমনটা আমায় লিখতে হচ্ছে। মুনাফা কি তাতে, আপনাদের খাইয়ে কী মোক্ষলাভ হবে বলুন তো!

প্রাণের আশঙ্কা হয়েছিল এক সভায়, সেই গল্প করি। কুষ্টিয়া শহরে, অনেক—অনেক কাল আগে। সভার মধ্যে হঠাৎ একজন এসে জিজ্ঞাসা করলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্জের 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' আপনার সম্পাদনায় বেরিয়েছে? মুসলিম লীগের আমলে মানুষের সৃষ্ট সেই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ—তার উপরে শ্যামাপ্রসাদের বই।

ঘাড় নেড়ে সায় দেবার অনতিপরেই দমাদম ইট পড়তে লাগল বাইরে। কোন এক সিনেমা-হলে সভাক্ষেত্র। ভলন্টিয়াররা দুড়দাড় দরজা এঁটে দিল। এক ভদ্রলোক এসে কানে কানে বলেন, সরে পড়ুন পিছনের দিক দিয়ে। আমার সঙ্গে আসুন, আমার বাড়ি পাশেই। দোতলার উপরে তুলে দেবে—সেখানে মাছিও ঢুকতে পারবে না।

ব্যাপারটা আঁচ করে অভ্যর্থনা-সমিতির এক কর্মকর্তা ছুটে

এসে পড়লেন : কী যুক্তি হচ্ছে আপনাদের ? কোনোখানে যাওয়া হবে না। ডায়াস থেকে নামান দেখি কত বড় ক্ষমতা।

হুমকিটা পরামর্শদাতা সেই ভদ্রলোকের উদ্দেশে, কিন্তু আমার দিকে চোখ পাকানো। বললেন, বন্দোবস্ত আমাদেরও আছে, ঝুড়ি ঝুড়ি ইট এসে গেছে। লেগে যাক দু-পক্ষে—কে হারে কে জেতে দেখা যাবে। হলে মানুষ গিজগিজ করছে, ইটের ভয়ে বাজে মানুষজনও বিস্তর ঢুকে পড়ছে। আর আপনি এই সময়ে সভাপতিকে ফোঁসলানি দিয়ে যজ্ঞ পণ্ড করতে যান ? এমনি মানুষে শুনতে চায় না—আটকা পড়ে গেছে, ভাল ভাল কথা যা বলবার বলে নিন এইবারে মজা করে। প্যাঁচে পড়ে বাছাধনদের শুনে যেতে হবে, না শুনে উপায় নেই।

সভা জমজমাট। বাইরে ধুন্দমার চলছে, ভিতরে বক্তৃতা। ভরতি-হল পেয়ে প্রতিটি বক্তা সাধ মিটিয়ে বলে নিলেন। আজকে আর ছাড়াছাড়ি নেই।

খুশবাগ

গঙ্গার কূলে কূলে যাচ্ছি। যাবো ও-পারের খুশবাগে। বর্ষা শেষ হয়ে শরৎ পড়ল। গঙ্গা এখন যৌবনমতী। স্ফীত জলধারা আবর্তিত হয়ে ছুটেছে।

মস্তবড় খেয়া-নৌকো। টলমল করছে, পার হতে গিয়ে বুকের মধ্যে কাঁপে। মেয়ে-পুরুষ বাচ্চা-বুড়ো বিস্তর লোক আমরা। সবসুদ্ধ তলিয়ে না যাই। তবু তো পুরো ভাঁটা এখন।

খানিকটা দূর এসে মাঝি বলে, নামুন—

সে কি হে, এই মাঝ-গঙ্গায় ?

নেমেই দেখুন, ডুববেন না। নৌকো কাদায় বসে যাচ্ছে, আর এগোবে না।

জলে না-ই ডুবলাম, কাদাতেও তো আটকে 'যেতে পারি। সভয়ে পিছু হেঁটে সকলের শেষে গিয়ে দাঁড়াই। নেমে পড়ুক আগের লোকেরা—ঐ মানুষগুলোর উপর দিয়ে পরখ হয়ে যাক।

জল ভাঙতে ভাঙতে সবাই এগিয়ে চলল। অত জনে যাচ্ছে, আমার তবে কি! খেয়ার কড়ি মিটিয়ে দিয়ে পায়ের জুতো হাতে মালকোঁচা মেরে বীরসজ্জায় নেমে পড়া গেল।

ছপছপ জলের আওয়াজ তুলে বেশ প্রমাণ সাইজের মিছিল হয়ে চলেছি বহু দূরের এক অড়হর-ক্ষেত লক্ষ্য করে। ক্ষেতে পৌঁছে গেলাম এক সময়ে। মত্ত কুঞ্জরের মতো পদদাপে অড়হরের চারা দলিত মথিত করে পারও হলাম ক্ষেত। তারপরেও ক্ষেত—মেস্তাপাটের। তার পরে কাঁটায় ভরা পোড়ো জমি। তার পরেও আবার ক্ষেত। ঘন পঙ্ক হাঁটু অবধি এমনি লেপটে গেছে যে এক একটা পায়ের ওজন নিলে বোধকরি মণের ধাক্কায় পৌঁছুবে। সেই পা, বিবেচনা করুন, একখানা করে তুলছি আর একখানা করে ফেলছি। ফেলেই চলেছি। ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া এর তুলনায় কিছুই নয়? কলম ফেলে ধান ভানবার শক্তিও ধরি, আত্মবিশ্বাস এসে গেল মনে মনে।

এতক্ষণের মধ্যে একটু জল পেলাম না যে পা ধুয়ে জুতো পরে ভদ্র সাজব। কাঁটা কত গণ্ডা ফুটেছে পা না ধোওয়া পর্যন্ত তারও হিসাব পাচ্ছি নে।

চার জন আমরা বিদেশি, আর সকলে আশেপাশের গাঁয়ের মানুষ। একজনকে শুধাই: পথঘাট তো নেই। আগাগোড়া এমনি ভুঁইক্ষেত বনবাদাড় ভেঙে যেতে হবে তোমাদের খুশবাগ অবধি?

পথ নেই মানে?

গাঁয়ের নিন্দেয় লোকটা চটে গেছে: এই তো পথ, দেখুন না ঠাহর করে। পথ কি একটা আমগাছের মতন হবে মশাই?

তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে মনে হল বটে, সবুজ ক্ষেতের ভিতর

আবছা সাদা রেখার মতন। মানুষের পায়ে পায়ে সাদা হয়ে উঠেছে।

লোকটা আরও ভরসা দিলঃ দুই যে ঘরের চাল দেখা যাচ্ছে না, ঐ খানটায় নবাবি সড়ক। সড়কে উঠে পড়লে আর কোন হ্যাঙ্গামা নেই, চোখ বুজে সোজা চলে যাবেন।

অতএব চলেছি। ওরা সব আগে আগে যাচ্ছে। যেখানে যেখানে পা ফেলছে, আমরাও নিরিখ করে ফেলছি ঠিক সেইখানে। অবশেষে ঘর এসে গেল। এবং অসমান এক কাঁচা রাস্তা।

বাপু হে, এই নাকি নবাবি সড়ক?

তারা ঘাড় নাড়ে। অবিশ্বাসের ভাব দেখে বলল, আজ যা দেখছেন তা নয়। ইটে বাঁধানো ছিল এ রাস্তা। কোদালি দিয়ে হাত দুই-তিন খুড়ুন না, ইট পেয়ে যাবেন।

কিন্তু আসন্ন সন্ধ্যায় এখন আর কোদালি মেরে পরখ করবার উৎসাহ নেই। কোদালিই বা পাচ্ছি কোথা? লোকগুলো ডাইনে হাটের পথে বেঁকে পড়ল। হন হন করে আমরা চলেছি।

জঙ্গল এঁটে আসে দু-ধারে, নবাবি সড়ক বুজে আসছে। গোড়ায় পাশাপাশি যাচ্ছিলাম, এখন এমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে· ঝোপঝাপ ঠেলে একটি মানুষেরই যাওয়া মুশকিল। সন্তর্পণে এগোচ্ছি, প্রতি পদে দু-দিক থেকে সাঁড়াশির মতন ডালপালা এঁটে এঁটে ধরছে। কলিকাসুন্দে নাটা ভাঁট আসশ্যাওড়া আর অজস্র বনতুলসী। মানুষ কেন বুনো জন্তুজানোয়ারেরও চোখে জল বেরিয়ে যাবে এই ঝোপজঙ্গল ভাঙতে।

তারপরে একটু ফাঁকায় এলাম। ঘরবাড়ি পথের এধারে-ওধারে। চাষী মুসলমান-পাড়া। ছাগল-গরু-মুরগি চরে বেড়াচ্ছে, মাচায় ঝিঙেফুল ফুটে আলো হয়ে আছে। লম্বা লম্বা ঝিঙে ঝুলছে। জঙ্গলের সমুদ্রের মধ্যে হঠাৎ একটু দ্বীপ পেয়ে গেলাম যেন। বহরমপুরের ওঁরা বলেছিলেন, বিকেলবেলা বেরোচ্ছেন—ঘোর হয়ে

গেলে বাঘ বেরোয় কিন্তু। সেটা নেহাত ভয়-দেখানো কথা বলে মনে হচ্ছে না।

বড় মধুর শীতল হাওয়া। গঙ্গা দেখা যায় না—কিন্তু দূরবর্তী নয়, বুঝতে পারি। হয়তো বা জঙ্গলটার ওপারেই। ঠিক তাই। মেঠো সুরে গান গেয়ে উঠল কারা ওদিকে—ক্ষেতের কাজ করতে করতে যে সব গান গায়। জঙ্গলের পারে গঙ্গার চরে ক্ষেত। আর এদিকে পথের ধারে প্রকাণ্ড এক তেঁতুল-গাছের ডালে পাখি ডাকছে। আহা, এমন নির্জন বিকেলবেলা ভরাট সুরে দীর্ঘচ্ছন্দে পাখির গান কতদিন শুনি নি। ক্ষেতের মানুষ আর বনের পাখিতে পাল্লা চলেছে। সোমরালি-বন—লাঠির মতো ফল। সাহিত্যিক জরাসন্ধ মশায় বললেন, বানরের লাঠি বলে একে।

যাচ্ছি, যাচ্ছি—। জঙ্গল ফুঁড়ে মিনার দেখা যায়, ইট বের-করা পুরানো গাঁথনি হাঁ করে আছে।

হাঁ-হাঁ—ঐ নাকি খুশবাগ? এসে গেছি তবে তো।

ভাল জায়গায় বিস্তর অসুবিধা করে রাখে। অনায়াস-প্রাপ্তিতে প্রীতি আসে না। যে মন্দির যত দুর্গম, পুণ্য তত বেশি সেখানে। খুশবাগ মন্দির নয়, কিন্তু কাদায় জলে দুস্তর করে রেখেছে। ফটকের মুখটায় টিউবওয়েল। গাঁয়ের মেয়ে-বউরা জল নিচ্ছে। নানা আকার ও আয়তনের মেটে-কলসি কিউ দিয়ে আছে। মানুষ নয়, শুধু কলসি। পালা এসে গেলে তখনই মানুষ দেখা দেয়। ঘটাঘট আওয়াজ তুলে চুড়ির নিক্বনিতে হস্তগুলি অবিরাম পাম্প করে চলেছে। জল বেরিয়ে যাবার নর্দামা নেই—ছোটখাটো একটা লেকের চেহারা নিয়েছে ঐখানে। খেয়াপারের মতো জুতো খুলতে হবে আবার এখানেও।

পাঁচিলে ঘেরা অনেকটা জায়গা। বিশাল ফটক—কিন্তু দরজা নেই, হা-হা করছে। লোকে খুলে নিয়ে ঘরে লাগাক

কিম্বা উনুনে দিক, যা হোক একরকম হয়েছে। ফটক পার হয়েই দু-পাশে দুটো ঘর। কয়েকটা মেয়েলোক তরকারি কুটছে, ছেলে খাওয়াচ্ছে, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে উনুন ধরাচ্ছে কাঠপাতা দিয়ে। আরও এগিয়ে চললাম। উলুক্ষেত—সাদা সাদা ফুল মাথা দোলাচ্ছে। বড় বড় আমগাছ—প্রবীণ চেহারা। তলায় জঙ্গল, এক পাশে একটু জায়গা কোপাচ্ছে একটা লোক।

তোমরা কারা ?

নতুন এসেছি বাবু। হিন্দু—পাকিস্তান থেকে এসেছি। এখানে ফুলগাছ-টাছ লাগাব, কর্তারা বলেছেন। তাই খুঁড়ছি।

খুশবাগ দেখাশোনার জন্য কেউ নেই ?

লোকটা বলে, আগে ছিল শুনেছি। দাঙ্গার সময় পালিয়ে গেছে। তারপর থেকে উপরওয়ালা—যিনি ত্রিভুবন দেখেন, খুশবাগও তিনি দেখছেন। চৌদিকের জঙ্গল দেখে বুঝতে পারেন না ?

ডাইনে বাঁয়ে সাধারণ কবর কতকগুলো। ঠিক সামনে, দেখতে পাচ্ছি, উঠানের অনেকটা জায়গা নিয়ে উঁচু করে বেদীর মতন গাঁথা। সেই উঁচুর উপরেও কবর। এঁরা কিছু উঁচুদরের হবেন, মরে গিয়েও সাধারণের উপরে। তা যত দরেরই হন, কবরের কিন্তু আচ্ছাদন জোটেনি কোন রকম। মুক্ত আকাশের নিচে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা মাথার উপর দিয়ে যায়।

এবারে এক পাকা দালান—এবং কি আশ্চর্য, কাঠের দরজা সম্বলিত। তারপরে ঠাহর করে দেখি, দরজার এমন জীর্ণ অবস্থা যে অতি-লোভীরও তার উপর নজর পড়বে না। সন্তর্পণে সেই বস্তু ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। আবছা অন্ধকার। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, কিন্তু তার জন্যে নয়—দিন দুপুরেও ঐ সঙ্কীর্ণ দ্বারপথে অতি সামান্য আলো ঢুকতে পায়। ঘরের মধ্যেও কবর অনেক। সব চেয়ে বড় কবরটার উপর লেখা রয়েছে গোপাল ভট্টাচার্য।

ভট্টাচার্যের কবর যে হতেই পারে না, এমন কথা বলি নে।

একটার খবর আমিই তো জানি। এখন কেউ তার নিরিখ করতে পারবেন না। এক কিশোর ছেলে মারা পড়েছিল রিভলবার চালাতে গিয়ে। শ্মশানঘাটে দাহ করতে গেলে বিপ্লবীদলের খবর ফাঁস হয়ে যাবে, নিশিরাত্রে জঙ্গলের ভিতর হাত দুই খুঁড়ে ফেলে তাকে মাটি চাপা দেওয়া হল। একটা গল্পও লিখেছিলাম তাকে নিয়ে। কী সব দিন গিয়েছে, কোথায় সেই সব সোনার ছেলে! জীবন দান করে তারা চলে গেল, মজা লুটছে আজকের মাতব্বরেরা।

যাকগে, যাকগে। এখানে সে ব্যাপার নয়—দেয়ালের যত্রতত্র এমনি বিস্তর নাম। দর্শকগণ খুশবাগ দেখতে এসে নাম খোদাই করে রেখে গেছে, মানুষের স্মৃতিতে একটুখানি থাকতে চায়। মহাকালের পা জড়িয়ে ধরে আকুতি: আমায় মেরে ফেলো না।

রহস্যাচ্ছন্ন অন্ধকার সেই কুঠুরির ভিতরের অজ্ঞাতনামা বহু কবরের গোলকধাঁধা কাটিয়ে উল্টো দরজা দিয়ে বেরোলাম। এখানেও কবর ছড়ানো।

তারপরে আবার এক ঘর। সর্বশেষ ঘর—তার পিছনে মসজিদ। লোকে যার জন্য কষ্ট করে আসে, সে বস্তু এখানে—এই ঘরের ভিতরে। ঘর কিন্তু পুরানো বলে ঠেকে না। অন্তত সামনে পিছনে বারাণ্ডা দুটো নতুন বানিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মসজিদ তিন গম্বুজের—এটাই সকলের পুরানো। আর কারুকর্মের যত-কিছু মহিমা সমস্ত এই মসজিদের চূড়ায়।

ঘরে না ঢুকে মসজিদ ও চারদিককার উঠানে ঘুরে ঘুরে দেখি। তারপর বসে পড়লাম সিমেণ্ট-করা বারাণ্ডায়। এতক্ষণের মধ্যে পরিচ্ছন্ন একটা জায়গা পাওয়া গেল। এমন যে গড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। শরৎচন্দ্র বহরমপুর সাহিত্য-সভায় এসে নাকি

তাই করেছিলেন। খুশবাগ দেখতে এসে এইখানে শুয়ে পড়ে রইলেন, সভাক্ষেত্রে আর তাঁকে নিয়ে তোলা গেল না।

খানিকক্ষণ জিরিয়ে অবশেষে ঢুকে পড়া গেল কবর-ঘরে। পিছনের কবরটা আয়তনে বিশাল, কালো পাথরে তৈরি। নবাব আলিবর্দি খাঁ মহব্বত জং বাহাদুর ঐ পাথরের নিচে মাটি নিয়ে আছেন। তাঁরই নামে এই ঘরবাড়ি, বাগবাগিচা ও মসজিদ। কিন্তু আমরা কী দেখতে এসেছি এখানে?

আলিবর্দির পাশে ছোট্ট একটু কবর—নিরিখ করা আছে, এই হলেন সিরাজদ্দৌলা। তারই গায়ে নামহীন আর এক কবর—লোকে বলে লুৎফউন্নিসা আছেন ওখানে। বাইরে ইতস্তত যে সব কবর ছড়ানো, তাদেরই মতন একটি। প্রক্ষিপ্ত এঁরা, পরে এনে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

দমাদম লাঠির বাড়ি পড়েছিল সিরাজের উপর। পিটিয়ে মেরে ফেলল। তাতেও খুশি নয়—মানুষজনকে দেখাতে হবে। হাতির পিঠে মড়া চাপিয়ে মুর্শিদাবাদ শহরময় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। দেখে নাও সর্বজনে, কী হাল হয়েছে তোমাদের নবাবের। মিছিল অন্তে দেহটা ছুড়ে ফেলে দিল চকের বাজারে। যার যতক্ষণ খুশি ভিড় করে দেখুক, পচে গিয়ে মাছি ভনভন করুক। এক আমিরের দয়া হল—বাজার থেকে তুলে নিয়ে তিনি আলিবর্দির পাশে মাটি দিয়ে দিলেন। নাতিকে চোখে হারাতেন আলিবর্দি—অভিশপ্ত নাতি বিস্তর হেনস্তার পরে তাঁর পাশে জায়গা পেল। আরও তেত্রিশ বছর পরে পঞ্চাশোত্তীর্ণা বৃদ্ধা প্রিয়তমা লুৎফাও পঁচিশ বছুরে তরুণ স্বামীর পাশে শয্যা নিল।

জুতো পায়ে ঢোকে সবাই, যথেচ্ছ নামধাম লিখে যায়। মানা করবার কেউ নেই। লুৎফউন্নিসা যত দিন বেঁচে ছিলেন—দীর্ঘ তেত্রিশ বছরের প্রতিটি সন্ধ্যায় একটি করে দীপ জ্বালিয়ে

দিয়ে যেতেন। এখন আর আলো জ্বলে না, তৈলহীন ধূলিধূসর একটা লণ্ঠন অবহেলায় পড়ে আছে কুলুঙ্গিতে।

চারিদিক নিঃশব্দ। মাটিতে সূঁচ পড়লে বোধহয় শোনা যাবে। অনেক দূরে কোন গাছে ঘুঘু ডাকছে অত্যন্ত ক্লান্ত সুরে। ডেকেই চলেছে।

বইয়ের বাজার

সাদা কাগজের বেশ টান, কাগজ বেচে কোঠা-বালাখানা হচ্ছে। কিন্তু ছাপাখানার কালি মাখলেই আর কেউ ছুঁতে চায় না।

মানুষ লেখাপড়া শিখছে, ইস্কুল-কলেজ স্থাপনা হচ্ছে এখানে ওখানে। খবরের কাগজেও দেখা যায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ফি-বছর। বইয়ের কারবারিরা মনে মনে বগল বাজাচ্ছিলেন। লেখাপড়া শিখছ যখন, শুধু পেটের ভাত খেয়ে আর স্ফূর্তি পাবে না, মনের খোরাক খুঁজতে বই-পাড়ায় ঢুঁ দিতে হবে। সে লক্ষণ সত্যিই দেখা দিয়েছিল। বাংলা বইয়ের এডিশন হয়—বছরের মধ্যে দুটো-তিনটেও। তাজ্জব ব্যাপার! সে-আমলে এক শরৎচন্দ্রের হত। যাক, সুদিন এলো বুঝি! চাকরি-বাকরি ছেড়ে অনেকে তো কোমর বেঁধে লাগলেন সাহিত্য-সেবায়। সাহিত্য যখন ভাত জোগাচ্ছে—এবং কয়েক-জনের ক্ষেত্রে পোলাও-কালিয়া—তখন আর কি! লেগে যাও এই কাজে আদা-জল খেয়ে। নতুন নতুন কারবারির উদ্গম কলেজ স্ট্রীটের অলিগলিতে। লেখকদের বৈঠকখানা সরগরম।

বই এখন কিছু নগদ নেই। একটি গল্প আসি-আসি করছে মাথায়।

ব্যস ব্যস! পাখার পতপতানি শুনেছেন যখন, পাখিও ঠিক

হাজির হবে। নিয়ে নিন অগ্রিম দাদন। অন্য কেউ না এসে জোটে আবার।

নাম-করা যত লেখক এবং খানিকটা-নামিরাও দেদার টাক পিটলেন ঐ মওকায়।

তারপরে এলো স্বাধীনতা। উল্লাসের অবধি নেই। হাসতে গিয়ে লোকে কিন্তু হাঁ হয়ে রইল দেশ-বিভাগের গতিক দেখে বাংলাদেশ দু-টুকরো—বড ভাগটা ঐ পাল্লায়। বোচকা-বিড়ে ও বউ-ছেলেপুলে নিয়ে তাঁতের মাকুর মানুষ মতো এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। এর মধ্যে বই কেনার পুলক আসে কেমন করে? বঙ্গভঙ্গে কত যে অনর্থ ঘটেছে, দিনে দিনে বাঙালি মালুম পাচ্ছেন বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র এই বাবদে প্রায় যে মরুভূমি হয়ে উঠল বড় বড় সমস্যার ফেরে সেদিকটায় কর্তাদের নজর নামে কই?

বড়লোকের মধ্যে বাংলা বইয়ের খদ্দের বেশি নয়। তাঁদের মনোরঞ্জনের ব্যয়বহুল নানা ব্যবস্থা আছে—বই কিনতে যাবেন তাঁরা কোন দুঃখে? আর মনের ব্যাপার উঠল তো খোলাখুলি বলি, মেদমাংসের চাপে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঐ বস্তু তাঁদের মধ্যে বিলুপ্তপ্রায়। একটা ব্যসন কিছুদিন ধরে চলিত হচ্ছিল—লেখক হওয়া। একে তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিজের নামটা গ্রন্থকার হিসাবে চালানো। এটা কিছু মন্দ নয়—লেখকদের উত্তম প্রাপ্তি ঘটত। আমরা লিখে থাকি একটিমাত্র স্টাইলে—ঝানু পাঠক নাম না দেখেই বলে দিতে পারেন, অমুকচন্দ্র লিখেছে। আর টাকা ব প্রতিপত্তির জোরে যাঁরা সাহিত্যিক, লেখা থেকে তাঁদের চিনবার জো নেই। নানা স্টাইলে লিখে থাকেন তাঁরা। রসিক পাঠক ভাবে বুঝে নিন, আমি কেন বলে নিমিত্তের ভাগী হই?

আর একটা ঝোঁক ঐ সঙ্গে দেখতাম, বই কিনে আলমারি সাজানো। খান দুয়েক তার থেকে অবহেলার ভাবে টেবিলে ফেলে রাখা—যে আসে সে নেড়েচেড়ে দেখুক, এইগুলিই যেন পড়া

হচ্ছিল আজকে সকালবেলা। এটাও ভাল। পড়ুন বা না পড়ুন, বই তো কাটে! কিন্তু বাংলা বইয়ের কারবারির বিশেষ মুনাফা নেই এ বাবদে। বেশির ভাগ ওঁরা ইংরেজি বই কেনেন। দোষ দেওয়া যায় না, স্বপ্নেই যখন খাওয়াদাওয়া, তখন মুড়িমুড়কি কেন, মোণ্ডামিঠাই খাবেন। বিদ্যাবত্তার চমক ইংরেজি বই দেখিয়েই বেশি দেওয়া যায়।

এই হল বড়মানুষি বৃত্তান্ত। গরিব যারা, তাদের কথা ছেড়ে দিন। ভাত-কাপড় জুটিয়ে তবে তো বই! ছেলেপুলেদের পড়াতে হচ্ছে, পড়িয়ে রুজিরোজগারের সুবিধে হবে ভেবে। কিন্তু বই রে, জামা-কাপড়-জুতো রে—নানারকম বায়নাক্কা। অত টাকা ঢালতে পারলে তবে তো! অতএব পেটের ভাতের বঞ্চনা করে বই যদি কিনতেই হয় তো কিনবেন তাঁরা ছাত্রপাঠ্য বই। অন্য সব বই বাহুল্য ও বিলাসবস্তু। অতএব অপাঠ্য।

বইয়ের খদ্দের মধ্যবিত্তরা—ভাঙা কোঠাঘরের মধ্যে বসে পুস্তক-রথে যাঁরা ত্রিভুবন বিচরণ করেন। স্বাধীনতার লড়াইয়ে এঁরাই প্রাণ দেন, যত-কিছু আদর্শবাদিতা এঁদেরই। বিশ্বসংসারের যাবতীয় মত ও পথ তাঁদের জানা—জানেন না শুধু কালাবাজারের প্রবেশপথটি এবং পারমিট-প্রাপ্তির ফন্দিফিকির। অতএব তাঁরাই আজ সবচেয়ে বিপন্ন। আয় বাড়ল না, অথচ ব্যয় অষ্টগুণ। পূর্ববঙ্গ থেকে যত পরিবার ভিটেমাটি ছেড়ে আসছেন, তাঁরাই বিপন্ন সর্বাধিক। পাকিস্তান হবার আগে ঢাকা-বরিশাল অঞ্চল বইয়ের সবচেয়ে বড় বাজার ছিল। সেখানকার মধ্যবিত্ত সমাজ একেবারে উৎখাত হয়ে গেল—বই কিনবে আর কে?

একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন সবাই। উদ্বাস্তুরা যে-ই একটু বসতির জায়গা পাচ্ছেন—আইন মাফিক অথবা বেআইনি যে রকমেরই হোক না—সঙ্গে সঙ্গে চালা তুলে দুটো খবরের-কাগজ আর দশখানা বই রেখে নাম দিচ্ছেন লাইব্রেরি। তার সঙ্গে

একটুখানি খেলাধুলোর জায়গা—একটা বা মাইনর-ইস্কুল, অন্তত পক্ষে পাঠশালা। এইসব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ডাক পড়ে আমাদের। আমার জন্মপল্লীতে (এখন পাকিস্তান) এক ব্রাহ্মণ পরিবার সম্পর্কে কিম্বদন্তী আছে, বর্গীর তাড়া খেয়ে ঐ অঞ্চলে এসে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন—পালাবার মুখে সর্বস্ব ফেলেও গৃহদেবতা শালগ্রাম-শিলা শুধু নিয়ে এসেছিলেন মাথায় করে। এ-ও ঠিক সেই বৃত্তান্ত। সব ছেড়েছেন এঁরা—কিন্তু সাংস্কৃতিক মনটা ফেলে আসতে পারেন নি।

পূর্ববঙ্গে ইতিমধ্যে এক বলিষ্ঠ নবীন সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। সে সমাজ কত দ্রুত বাড়ছে, বাইরে থেকে তার ধারণা হয় না। অনেক বছর আগে ঢাকায় গিয়ে দেখে এসেছিলাম, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর দাবি রক্তের লিখনে তাঁরা ব্যক্ত করেছেন। ভালবাসার এমন নিঃসংশয় প্রকাশ কোন দেশে কে দেখেছে? ভাল বইয়ের জন্য তাঁরা ছটফট করছেন, দেখতে পেলাম। আমদানি কড়াকড়ির জন্য পূর্ববঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বই পাওয়া অতিমাত্রায় দুর্ঘট। একটা সদ্যপ্রকাশিত বাংলা বই ছিল আমার সঙ্গে, পড়তে পড়তে গিয়েছিলাম। কথাটা জাহির হতে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল বইটা নিয়ে—পাঁচ-সাত জনে মাথা ঠোকাঠুকি করে একত্র পড়ছেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরে লঙ্গরখানায় ভিখারিদের কাড়াকাড়ি করে খাওয়া দেখেছি। বললাম, সেই ক্ষুধিত দৃষ্টিই যেন আপনাদের চোখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং লিটন-হলে আমাকে সাহিত্য সম্পর্কে বলতে হল। ডক্টর শহীদুল্লা, কাজি মোতাহার হোসেন প্রমুখ বহু বিদ্বজ্জন ছিলেন ঐ সভা দুটোয়, সেখানেও এই প্রসঙ্গ। কী সর্বনাশ, পাঁচিল তুলে সংস্কৃতির পথ আটকানো! বললেন, বাংলা বই পাঠাবার ব্যবস্থা করুন যেমন করে হোক। কিন্তু সামান্য সাহিত্যজীবী—এক্তিয়ার কতটুকু আমাদের!

অতএব দোকানের আলমারি-ভরা বই যেমন-কে-তেমন পড়ে থাকে। ঈশ্বরের সৃষ্টি উই-ইঁদুর আছে বলেই যা-কিছু কাটছে—খদ্দেরের কাছে বিশেষ নয়। আর সালতামামির মুখে ঠোঙা করবার প্রয়োজনে মনের ওজনে ফর্মা নিয়ে যায়। তাই রক্ষা, নইলে দপ্তরিপাড়ার ঘরে ঘরে হিমালয়পর্বত জমে উঠত।

বই কাটাবার এক উৎকৃষ্ট উপায়, বিনামূল্যে বিতরণ। পয়সা দিয়ে কিনবার লোকাভাব, কিন্তু মুফতে গ্রহণের বিশেষরূপ চাহিদা আছে। তুমি ছেপেছ বই, ও-বই আবার কিনে পড়তে হবে নাকি? পরম বন্ধু অভিমান প্রকাশ করেন: তোমার অমুক বইটা বেরিয়েছে শুনছি—আমি তো পেলাম না একখানা! সকলের অভিমানের মর্যাদা যদি রাখতে হয়, বিক্রির একখানা বইও বাকি থাকবে না। রোজ ডাকে রবারস্ট্যাম্প-মারা পাঁচ-সাতখানা চিঠি আসে—'সাহিত্যমোদীরা মিলিয়া উপরোক্ত পল্লী-পাঠাগার খুলিয়াছি। আপনার সমস্ত বই এক খণ্ড করিয়া উপহার পাঠাইলে পরম বাধিত হইব।' বই ছাপতে যে টাকাপয়সা লাগে, এবং ছাপা বাঁধাই কাগজের ব্যয় যে দশগুণ বেড়েছে, অভিমানপর বন্ধুবর্গের কিম্বা সাহিত্যমোদী পল্লী-মহাশয়দের সে ধারণা নেই। বই ছাপা নিতান্তই যেন শখের ব্যাপার।

অবস্থা এমন, ভারি প্রবন্ধের বই—তা সে যত ভালই হোক—আদৌ চলবে না, যদি না পরীক্ষার প্রশ্ন আসবার সম্ভাবনা থাকে সেই বই থেকে। কবিতার অবস্থাও তথৈবচ। চীনে গিয়েছিলাম—টেগোরের স্বজাত বলে উঁচু মাথায় খাতির কুড়িয়ে এসেছি। অথচ রবীন্দ্রনাথের এই বাংলা দেশেই বিজ্ঞাপনের যত ধাকাধাক্কি করুন, কবিতার বই অনড় হয়ে থাকবে মনুমেণ্টের মতো। বাংলা ছোটগল্প নিয়ে গর্ব করা হয়—পত্রপত্রিকায় গল্প না হলে চলে না। তাগিদে পড়ে লেখকদের লিখতে হয় অধিকাংশ গল্প। কিন্তু ঐ নগদ যা-কিছু প্রাপ্তি হল লেখা বেরুনোর সঙ্গে। গ্রন্থাকারে

প্রকাশের বড় আশা নেই। বিক্রি হয় না, কাঁহাতক লোকসান খাবেন প্রকাশক ? কিছু কাল থেকে এক কায়দা চলছে মন্দ নয়—নাম-করা লেখকদের শ্রেষ্ঠগল্প সরসগল্প ইত্যাদি বেরোচ্ছে। এই উপায়ে পাঠক পাকড়ানোর চেষ্টা। একটা বইয়ের ভিতরে উক্ত লেখকের যা-কিছু ভাল ভাল মাল—দেখুন না কিনে। কিনেই দেখুন, পস্তাবেন না।

চলে কিছু উপন্যাস। লাইব্রেরির কর্তারা উপন্যাসই কেনেন প্রধানত। বেশ ওজনদার হবে, এক লহমায় ফুরিয়ে না যায়—পাঠকের এইরকম চাহিদা। নেশা জমতে না জমতে ছোটগল্প ফুরিয়ে যায়, উপন্যাস বেশ বুঁদ হয়ে উপভোগ করা চলে। আরও একটা জিনিস চলছে আজকাল—রম্যরচনা। বেশ ঝরঝরে ভাষা, হাসি বিচ্ছুরিত হবে লেখার ঢঙে। এরকম বই পছন্দসই পাঠকের।

প্রকাশকদের মধ্যে দু-দশ টাকা পেয়ে থাকেন যাঁরা পাঠ্য-পুস্তকের কারবারি। ওটা কিনতেই হবে, চাল-কাপড়ের সমপর্যায়ে পড়ে। লিস্টি সাবাড় একবারে না করতে পারেন, মাসে মাসে কিনুন। ছেলে কাঁদছে বইয়ের জন্য, ক্লাসের মাস্টার বকাবকি ও ঠেঙানি দিচ্ছেন বই না থাকায়—অতএব গিন্নির কাপড় কেনা মুলতুবি রেখেও বইয়ের বাজারে ঢুকতে হবে।

তা বলে এ পথ নিরঙ্কুশ নয়। ঘাঁতঘোত যাঁরা ভাল জানেন, মজা লোটেন তাঁরাই। বিষম প্রতিযোগিতা—ইস্কুলে বই ধরানো আর ওয়াটার্লুর লড়াই জেতা প্রায় সমান কথা। বই ভাল হওয়াটাই গুণ নয়—বরঞ্চ লিখন-দক্ষতার চেয়ে অপরাপর গুণ থাকার দরকার প্রকাশক ও লেখকের পক্ষে। তা-বড় তা-বড় পণ্ডিত পাঠ্যপুস্তক লেখেন—ষাট-সত্তর পাতার এক চটি বই লিখছেন দু-জনে তিনজনে মিলে! অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরদের যথাসম্ভব একত্র জুটিয়ে ওজন ভারী করা। তারপর সেই বই শিক্ষাবিভাগের মনোনয়ন নিয়ে বাজারে বেরুলে

দুর্জন কাগজওয়ালারা হৈ-হৈ করে ওঠেঃ কী কাণ্ড, নতুন পাঠ নিতে হবে যে এখন থেকে, গ্রীনউইচ ভারতের পূর্বদিকে, শান্তিপুরের কারিগর আহা-মরি কাঁসার বাসন বানায় ইত্যাদি। ওরা চেঁচালে কী হবে—যা-হোক কিছু আছে তবু উক্ত বইয়ে, স্রেফ সাদা কাগজ থাকলেও ও-বই হু হু করে কাটবে নাম-মহিমায়। ঐ দরের মানুষ—এত সব ছাইভস্ম লিখলেন কী করে? এই দেখুন—ওঁদের কী দোষ, ওঁরা নিরীহ নির্বিরোধী। লিখেছে 'ক'-লিখতে কলম ভাঙে এমনিতরো কেউ সাড়ে-দশ টাকা ফর্মা হিসাবে। বই আগেভাগে ছাপা হয়ে গেছে—প্রকাশক-ঐরাবত তারপরে পথে বেরোলেন গ্রন্থকার খুঁজতে। মোটা দক্ষিণা অন্তে খ্যাতিমান গ্রন্থকার বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন—প্রকাশক তাঁকে শুঁড়ের উপর তুলে নিয়ে বইয়ের টাইটেলের পাতায় বসিয়ে দিল। ভিতরে সাপ আছে না ব্যাঙ আছে—উনি তা জানবেন কী করে?

যাকগে, হচ্ছিল বই ধরানোর কথা। নবেম্বর ডিসেম্বর এই দুটো মাস মাস্টারমশায়দের মেজাজের থই পাওয়া যায় না। তাঁরাও বোঝেন তা। বলেন, এর পরে কি ছায়া মাড়াবেন পাবলিশাররা? দোকানে গেলে চিনতেই পারবেন না। সকলে ঘিরে বসে আছেন, ছায়াময় বটবৃক্ষ এবং অমৃতনিধি সমুদ্রের সঙ্গে উপমা দিচ্ছেন—শুনতে মন্দ লাগে না। আপনারা ছাড়া হেন মধুবাক্য শিক্ষকদের কে কবে বলে থাকে?

দিন-কে-দিন অবস্থা আরও সঙ্গিন হচ্ছে—শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না অনেক ক্ষেত্রেই। প্রকাশক গিয়ে ধরলেন, আমার চারখানা বই ঢুকিয়ে দিন—লিস্টি ছাপিয়ে দিচ্ছি, সিকি পয়সা আপনাদের খরচা নেই। দ্বিতীয় জনে হানা দিলেন, এক কোম্পানির চারখানা কি মাস্টারমশায়! সবাই ছিঁটেফোঁটার প্রত্যাশী—সব মধু এক পিঁপড়েয় টানবে কেন? তিনটে বই দেবেন আমার। শেষ পর্যন্ত একজনে একখানা বইতেই রফা করে নিলেন। লিস্টি

বেরিয়ে এলে দেখা গেল, সাত-সাতখানা বই সেই কোম্পানির। কী বৃত্তান্ত? কোম্পানির ব্যক্তি তখন গাল চাপড়ান: বিলকুল ছাপার ভুল—এক বইয়ের জায়গায় ভিন্ন বই বসিয়ে দিয়েছে ভুল করে। ক্ষমাঘেন্না করে নিন এবারটা, অমন লক্ষ্মীছাড়া প্রেসে যাচ্ছিনে আর কখনো। আর জনান্তিকে বলছেন, একশ আশি টাকা লাগল লিস্টি ছাপতে, একটা-দুটো বইয়ে পোষানো যায়? এঁদের আক্কেলবিবেচনা থাকলে অতগুলো ছাপার ভুল হতে যাবে কেন?

এ ছাড়া বই ডাইনে বাঁয়ে ছড়াতে হবে। ক্লাসে পাঁচটা সেকসন, সেই বাবদে পাঁচ আর গরিব ছাত্রের জন্য তিন, একুনে আটখানা চাই। কাঁইকুই করেন তো সোজা ঐ পথ দেখা যাচ্ছে। তা না হয় দেওয়া গেল, কিন্তু এই বিতরিত বই নিয়েও ব্যবসায়ের দরাজ বন্দোবস্ত। ক্যানভাসার তো এমনিভাবে বই ছড়াচ্ছে, আর একদল তার পিছু পিছু ঘুরছে সস্তা দরে ঐ সমস্ত বই কুড়োবার তালে। ধরুন, একটা মহকুমার পাঁচটা ইস্কুলে সাহিত্য-কৌস্তুভ লিস্টিভুক্ত হল। প্রতিযোগিতার বাজারে তার বেশি আর কী চাইবেন? শতখানেক বই বিতরণ হয়েছে উক্ত মহকুমায়। তার মধ্যে কমপক্ষে পঞ্চাশ ষাটখানা ফিরে এসে পুরানো বাজারে ঢুকেছে। সেইগুলো খতম হয়ে গেলে তবে খদ্দের নতুন বইয়ের দোকানে ঢুকবে।

'ভুলি নাই' প্রসঙ্গে

'ভুলি নাই' ছবি তোলা হচ্ছে। ডিরেক্টর হেমেন গুপ্ত। সকালবেলা আমার বাড়ি এসে বললেন, চলুন যাই প্রেসিডেন্সি জেলে—

পুরানো মায়া উথলে উঠল নাকি ?

হেমেন গুপ্ত বিপ্লবী ছিলেন একদা। ফাঁসির দড়ি থেকে পিছলে বেরিয়ে এসেছেন। সাক্ষ্যে গোলমাল করে এক ইংরেজ কর্মচারী বাঁচিয়ে দিয়েছিল। সেই গল্প গুপ্ত মশায়ের কাছে শোনা। লোকটাকে খতম করে দিচ্ছিল সঙ্গীরা, রিভলভার তুলেছিল —হেমেন গুপ্ত নিরস্ত করলেন তাদের। ধরা পড়ে তারপর কোর্টে দলসুদ্ধর বিচার হচ্ছে। প্রধান সাক্ষিদের একজন হল সেই ইংরেজ। হেমেন গুপ্তকে চিনেও সে চিনল না। সাক্ষ্য দিতে দাঁড়িয়ে এখন এক কথা বলে, তখন এক কথা। ইচ্ছাকৃত—হেমেন গুপ্তর উপকার সে মনে রেখেছিল। গুপ্তমশায় তারই জন্য বেঁচে বেরিয়ে এলেন। এবং এটা-ওটা করতে করতে অবশেষে সিনেমা-ডিরেক্টর। আমার 'ভুলি নাই' গল্পটা নিয়ে পড়েছেন এবারে।

গাড়ি দরজায়। গাড়ির ভিতর বসে আর একজন—বীরেন নাগ। ছবির যাবতীয় দৃশ্য-পরিকল্পনা তাঁর। ফাঁসি হবে বিপ্লবী নায়কের। দৃশ্যটা যতদূর সম্ভব নিখুঁত করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রেসিডেন্সি জেলে সেইজন্য যাওয়া। জেলকর্তাদের অনুমতি নেওয়া হয়েছে। কানাইলাল সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ সর্বত্যাগীদের আত্মত্যাগের মহিমায় এই ফাঁসিমঞ্চ অতি-পবিত্র। তীর্থভূমির মতো। সেইখানে যাচ্ছি। ফাঁসির সময়ের যাবতীয় রীতিপদ্ধতি বুঝে বীরেন নাগ ফাঁসিক্ষেত্রের

স্কেচ করে নিয়ে আসবেন। অবিকল তেমনি বস্তু গড়া হবে স্টুডিওর মধ্যে।

ফাঁসির দড়িটা নেড়েচেড়ে দেখা হল। ওঁদের একজন কোড পড়ে যাবতীয় প্রক্রিয়া বুঝিয়ে দিলেন। ফাঁসির ব্যাপারটা সুস্পষ্ট যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি। তারপরে জায়গাটায় গেলাম। একফালি উঠোন—চারিদিকে ঘরবাড়ি। গোটাকয়েক গরুবাছুর নিশ্চিন্তে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে ফাঁসি-সেলের ঠিক পিছনটায়। আসামিদের ঐ পিছন দরজা খুলে নিয়ে আসে।

দরজা থেকে ভূমি ক্রমশ উঁচু হয়ে গিয়ে মঞ্চের উপর উঠেছে। যেদিন কারো ফাঁসি হবে, আগের রাত্রে আশেপাশে দোতলার কয়েদিদের সরিয়ে দেয়। জানলা দিয়ে দেখতে না পায় ফাঁসি। এই সরানোর ব্যাপার থেকে সকলে বুঝে নেয়, যাচ্ছে কোন এক হতভাগা। একলা একজন না হয়ে এক জোড়াও হতে পারে। মঞ্চের উপর একই সঙ্গে দুটো ফাঁসির ব্যবস্থা আছে। পাইকারি হারে খরচাও বোধহয় কিছু কম।

এক ভদ্রলোক আমাদের দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বহুদর্শী ব্যক্তি। বললেন, স্বদেশি ছেলেদের দেখেছি, সেলের দরজা খুলে দিতে না দিতে এক-ছুটে তারা মঞ্চের উপরে চলে আসে। প্রাণের পরোয়া করে না, প্রাণ দেবার জন্য পাগল। ফাঁসি হয় সাধারণত ভোররাত্রে—তাই বোধহয় নিয়ম। আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করে। চারিদিক মন্ত্রিত করে ধ্বনি দেয় তারা—'বন্দে মাতরম্'। নিশ্চিন্তে নিদ্রামগ্ন দেশের মানুষদের উদ্দেশে মার্জনা ভিক্ষা করে নিজেই গলায় তুলে নেয় ফাঁসির দড়ি। সরকারি কানুন মেনে ষোলআনা পর্ব শেষ হতে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে পড়ে—এই দেরি সহ্য হচ্ছে না তাদের যেন। অধীর হয়ে বারম্বার তাগিদ দেয়: কত দেরি আর? কত?

কিন্তু সাধারণ ডাকাত-খুনির ব্যাপার ভিন্ন। ফাঁসির আগে

পর্যন্ত হাউ-হাউ করে কাঁদে, অভিশাপ দেয়, মাথা কোটে প্রাণভিক্ষা চেয়ে। ফাঁসিমঞ্চে নিয়ে তোলার মুখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে অনেকে।

সেদিন সূর্য সেনের ফাঁসির কাহিনী শুনে এলাম। সূর্যের মতো চিরভাস্বর বাংলাদেশের বড় আদরের মাস্টার দা। গল্পকার প্রত্যক্ষদর্শী—চট্টগ্রাম জেলে ছিলেন তিনি সেই সময়। সূর্য সেনের ফাঁসি ভোররাত্রে না হয়ে রাত দুপুরে হল। কর্তৃপক্ষ খবর পেয়েছিল, জেল আক্রমণ করে মাস্টার-দা ও অন্যান্য কয়েদিদের ছাড়িয়ে নেবার আয়োজন হচ্ছে। খবর সত্যি হোক কিংবা মিথ্যে হোক, বিষম ঘাবড়ে গেল কর্তারা। নিয়ম-কানুন দেখতে গেলে হবে না, চুপিসাড়ে তাড়াতাড়ি শেষ করে দাও।

নিশিরাত্রে সেলের দরজা খুলে গেল। মঞ্চে নিয়ে যাবে এবার, সূর্য সেন বুঝতে পারলেন। এক পা-ও নড়বেন না তিনি নিজের ইচ্ছায়। জবরদস্তিতে কর্তারা কবে পিছপাও? টানাহেঁচড়া চলল। সূর্য সেন মন্দ্রকণ্ঠে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন—দেশের মুক্তিসাধনার বাণী। ঘুম ভেঙে কয়েদিরা শুনতে শুনতে অধীর হয়ে উঠছে। না, এমন জিনিস চলতে দেওয়া যায় কেমন করে? নির্মম নিদারুণ প্রহার চলল। ভ্রূক্ষেপ নেই বীর নেতার। অবশেষে এক সময় চেতনা হারিয়ে মেজেয় পড়ে গেলেন। তখন আর অসুবিধা নেই। অচেতন দেহ বয়ে নিয়ে মঞ্চে তুলল। ফাঁসি হয়ে গেল সেই সংজ্ঞাহীন অবস্থায়।

তারপরেও আছে। ফাঁসির পরের ঘটনা বলতে লাগলেন ভদ্রলোক। মঞ্চের নিচে গর্ত—শবদেহ সেখানে গিয়ে পড়ে। শেষ পর্বে গলার রশি কেটে দেহ বাইরে এনে রেখেছে। ফিরিঙ্গি সার্জেন্টগুলোর রাগ পড়েনি। জুতো-পায়ের লাথি মারছে মৃতদেহের উপর।

তন্ন তন্ন করে দেখা হল অনেকক্ষণ ধরে। খবরবাদ নেওয়া হল সমস্ত। ফাঁসি দেবার জল্লাদরা সরকারের মাইনের লোক নয়। সারা বাংলাদেশে জন পাঁচ-ছয় জল্লাদ আছে। ফাঁসি আসন্ন হলে জেলখানা থেকে কোন একজনকে খবর পাঠিয়ে দেয়, সে চলে আসে। বাঁধা রেট—প্রতিটি কাজের দরুন এত করে পাওনা। একসঙ্গে ঝুলানো হলে পাইকারি হারে হিসাব হবে। এ ছাড়া যাতায়াতের খরচা। শিবু বলে এমনি একজনের খোঁজ পাওয়া গেল—শিবু বাগদি। হেমেন গুপ্ত তার নাম-ঠিকানা টুকে নিলেন। চিঠি গেল তার কাছেঃ অমুখ তারিখে অমুখ ঠিকানায় চলে এসো। জেলখানা নয়, সিনেমা-স্টুডিও। ফাঁসির ব্যাপারই বটে, নিয়ম-মাফিক টাকাও পাবে সে—তবে আসামির গায়ে আঁচড়টি পড়বে না। শিবুকে জল্লাদ হয়ে অভিনয় করতে হবে।

ফাঁসির সময়টা গেলাম দেখতে। চোখের জলে স্টুডিওর ভিতরের কাউকে দেখতে পাচ্ছিনে। জল এসেছে ফাঁসির কারুণ্যে নয়—ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে। অজয় কর ক্যামেরাম্যান, এত ধোঁয়াতেও খুশি নন তিনি। আরও চাই, আরও। ক্যামেরা-দৃষ্টির বাইরে দু-তিন জনে খড় পুড়িয়ে ধোঁয়া করছে। ফাঁসি শেষরাত্রে, চারিদিক ঘন কুয়াসায় আচ্ছন্ন। ধোঁয়া করে সেই কুয়াসা বানানো হচ্ছে।

চোখ সয়ে গেল ক্ষণপরে। দেখতে পাচ্ছি সকলকে। জেলের পোশাক-পরা নায়ক ফাঁসির জন্য প্রস্তুত। কখন ডাক পড়ে—তৎপূর্বে তাড়াতাড়ি সিগারেটে দু-টান টেনে নিচ্ছেন। মানুষটি হলেন এখনকার সুবিখ্যাত প্রদীপকুমার। 'ভুলি নাই' ছবিতেই নাম করলেন। আগে বোধহয় আর একটা ছবিতে নেমেছিলেন, সুবিধা করতে পারেন নি। 'প্রদীপকুমার' নাম নিলেন 'ভুলি নাই' ছবি থেকেই। আসল নাম—শীতল বটব্যাল। সুদর্শন চেহারা। হেমেন গুপ্ত শুধুমাত্র চেহারা দেখেই তাঁকে পছন্দ করলেন। অমন

ছেলেটা উত্তম উত্তম কথা বলে দেশের কাজে ফাঁসি যাচ্ছে—অভিনয় যদ্দূর হয় হোক, চেহারার জন্যই দর্শক আকুল হয়ে উঠবে। বিচারে ভুল হয় নি গুপ্তমশায়ের। নায়কের ফাঁসির সময়টা সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ মুহ্যমান হয়ে পড়ত। মেয়েদের মধ্যে মূর্ছাও গিয়েছেন অনেকে। এর মধ্যে সুরকার হেমন্ত মুখুজ্জের অনেকখানি দান। ফাঁসির সময়কার বাজনাটা হয়েছিল অসামান্য। দেব-কিশোরের মতো ছেলেটার গলায় রজ্জু পরিয়ে টান দিল, সেই মুহূর্তে বাজনার মধ্য দিয়ে আকাশ-বাতাস এবং নিষুপ্ত ধরিত্রী যেন একসঙ্গে হাহাকার করে উঠল। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত সেই জায়গায়, চোখের জল রোধ করা যেত না। শুধুমাত্র যন্ত্রের বাজনা নয়, সেই সঙ্গে মানুষের কণ্ঠ মিশিয়ে আ-হা-হা—একটা মর্ম-ছেঁড়া আর্তধ্বনি।

শিবু বাগদিকে কোন পার্ট শেখানো হয় নি। বরঞ্চ তাকেই খানিকটা ডিরেক্টর বলা যেতে পারে। ফাঁসির অনুষ্ঠানে সে-ও অনেক নির্দেশ দিচ্ছে। বহুদর্শী মানুষ সে—বলা হয়েছিল, সত্যিকার ফাঁসিতে যেমন-যেমন করে থাক, যা কিছু বলো—অবিকল তেমনি করবে। আধ-খাওয়া সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে প্রদীপকুমার তো উঠে এলেন ফাঁসিমঞ্চে। চোখের উপর ঢাকা পরাতে গেল শিবু। প্রদীপকুমার হাত নেড়ে দিলেন ঃ দরকার নেই। এ সমস্ত শিবুর শেখানো—ফাঁসির সময়ে স্বদেশিবাবুরা বলে থাকেন এমনি। তারপর শিবু করজোড় করে বলল, আমার দোষ লিবেন না বাবুমশায়, সরকারের হুকুমে আমায় এই কাজ করতে হচ্ছে।

স্বদেশিবাবুদের ফাঁসির আগে শিবু নাকি প্রতিটি ক্ষেত্রে এমনি ভাবে মার্জনা চেয়ে নেয়। ছবির মধ্যেও তাই করল।

ছবির মালিক ন্যাশন্যাল প্রগ্রেসিভ পিকচার্স লিমিটেড নামক নতুন একটি প্রতিষ্ঠান। অনেকগুলো নাম-করা ছবি তুলেও

প্রতিষ্ঠান যথারীতি পঞ্চত্ব লাভ করেছে। আজকের দুই বিখ্যাত ডিরেক্টর সত্যেন বসু ও সুধীর মুখুজ্জে ছিলেন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। ওঁরাও পার্ট করেছিলেন 'ভুলি নাই' ছবিতে। লম্বা দাড়ি পরে সত্যেন বসু সুরেন বাড়ুয্যে সেজেছিলেন, সিকি মিনিটের মতো বক্তৃতাও ছিল। সুধীর মুখুজ্জে হলেন বিপিন পাল, তাঁর বক্তৃতাও ঐ মাপের। তা ছাড়া আরও এক জায়গায় সুধীর মুখুজ্জে নেমেছিলেন, না বলে দিলে কারও টের পাবার কথা নয়। ভাল সাঁতারু তিনি, দীর্ঘদিন লেকে নৌ-চালনার শিক্ষাদাতা ছিলেন। এক বিপ্লবিনী মেয়ে পুলিশের তাড়ায় ছুটতে ছুটতে নদীতে ঝাঁপ দিল—সুদীপ্তা রায় সেই পার্ট করলেন। মুশকিল হল, সাঁতার ভাল জানেন না তিনি। পুলিশ তাড়া করেছে, ছুটছেন তিনি। ছুটতে ছুটতে নদীকূলে এসে পড়লেন। এ পর্যন্ত সুদীপ্তা। তারপরে নিরুপায় মেয়ে ঝপাস করে করাল নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্রোতে ভেসে গেল। এসব সুধীর মুখুজ্জে করছেন। মেয়েটার শাড়ি পরে নিয়েছেন তিনি, কলসি কাঁখে নিয়েছেন। ক্যামেরা পিছনে—পিছন দিকটাই দেখতে পাচ্ছি শুধু। কখন মানুষ বদল হয়ে গেছে, দর্শক ধরতে পারলেন না।

ছবিটা সেন্সর থেকে আটকে দিল, বাইরে দেখাতে দেবে না। পুলিশের আপত্তি : দেশদ্রোহীকে হত্যা করল, ছবি দেখে মানুষের সেই মনোভাব আবার আসতে পারে। এক মন্ত্রী—সেকালের বিপ্লবনেতা তিনি—পুলিশের জনৈক কর্তাব্যক্তিকে বললেন, বুঝতে পেরেছি, আপনার সেই আত্মীয়টির কথা মনে পড়ছে। সেই মানুষকে হত্যা করার ভার গোড়ায় আমারই উপর পড়ে। কিন্তু জরুরি কাজ এসে পড়ায় অন্যে এসে ভার নিল। সেই আমরাই আজ সরকার গড়েছি। দিনকাল বদলে গেছে, খেয়াল রাখবেন।

এক জায়গায় আছে, সেলের মধ্যে দেশপ্রেমীকে নির্মম বেত মারা হচ্ছে। কাটছাঁট করে কিছু মোলায়েম করা

হল। তবু আপত্তি ওঠে: লোকে দেখে ভাববে এমনি অত্যাচারী বুঝি পুলিশ।

তা কেন হবে? তারা আর আপনারা এক নন। তারা ইংরেজ-আমলের, আপনারা স্বাধীন-ভারতের। করুণা ও সদাশয়তার অবতার আপনারা—লোকে এটুকু স্বচ্ছন্দে বুঝে নিতে পারবে।

তখন কে-একজন বললেন, পুরানো ক্যালেণ্ডার ঝুলিয়ে দেওয়া হোক ওখানে। ক্যালেণ্ডারে লোকে পড়ে নেবে, উনিশ-শ দশের ঘটনা।

কিন্তু অন্ধকার নির্জন সেলের দেয়ালে ক্যালেণ্ডার—সেটা কেমন যেন হয়। রদ হয়ে গিয়ে নতুন প্রস্তাব হল: মহাত্মা গান্ধীর কয়েক ফুট ডকুমেণ্টারি ছবি এবং কিছু বক্তৃতা জুড়ে দেওয়া হোক মূল-ছবির শেষে। যাতে হিংসার ধকলগুলো কাটিয়ে নির্মল অহিংসা রসে দর্শকের মন আপ্লুত হয়। অহিংস চিত্ত নিয়ে সকলে ঘরে ফিরতে পারে।

তথাস্তু। নইলে ছবির ছাড় হয় না। মূল-ছবি শেষ হয়ে যাবার পরে অহিংসার মহিমা শোনানো হত মিনিট কয়েক ধরে। চোখ মুছতে মুছতে মানুষ তখন উঠে পড়েছে। পর্দায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, দেখবার জন্য কেউ দাঁড়ায় না। এই বুঝে কিছুকাল পরে বাদ দেওয়া হল শেষের প্রক্ষিপ্তটুকু।

শরৎ-কথা

আকাশের দিকে চেয়ে মনে হয়, চাঁদ স্নিগ্ধ চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে—এ আমার, একলা আমার। ভাবতে পারিনে, ভাবতে হয়তো ব্যথা লাগে, চাঁদের এই স্মিতদৃষ্টি সকলেরই উপর। শরৎচন্দ্রের কাছে গেলেও এমনি একটা ভাব হত। মানুষের পরে এমন দরদ আর কোথাও দেখিনি। তিনি মুখেও বলতেন, মানুষ ছাড়া কিছু বুঝিনে। আমার সব গল্পই মানুষের গল্প। মুখে যা-ই বলো না কেন, তোমরা ঐ মানুষের গল্পই শুনতে চাও। তাই আমাকে এত ভালবাস।

সামতাবেড়ের পল্লীবাসে শরৎচন্দ্রকে দু-একবার দেখেছি। বালীগঞ্জে শরৎচন্দ্র ছিলেন চালচিত্র-হীন প্রতিমার মতো। পল্লীর পরিবেশে তাঁকে যে না দেখেছে, সে তাঁকে উপলব্ধি করবে কী করে?

মনে পড়ে, সেটা শীতকাল। উঠান ও বারাণ্ডা ভরে গেছে গ্রামের নানা বয়সি স্ত্রী পুরুষে। সকলের মাঝখানে ইজিচেয়ারে বসে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র—পাশেই এক বাঁশের চোঙা ভরতি-রকমারি ফাউন্টেনপেন।

স্টিমার থেকে নেমে বালির চড়া ভেঙে অবশেষে উঠানে পৌঁছানো গেল। সস্নেহ আহ্বান আসে: এসো, এসো—

সুদূর গ্রামপ্রান্তে দাদাঠাকুরের গোপন কীর্তি অনেকক্ষণ ধরে প্রত্যক্ষ করলাম। শুধু পয়সা দিয়ে দায়-সারা নয়, ঘর-গৃহস্থালির সকল খবর নিয়ে তবে এক একজনের ছুটি। একজনকে বললেন, তোর মেয়ে কেমন আছে রে ছবির মা?

ভাল আছে দাদাঠাকুর, ওষুধ তোমার ধন্বন্তরী।

শরৎচন্দ্রের বিয়োগের ঠিক পরেই এই লেখা দিয়ে স্মৃতিতর্পণ করে-ছেন

কিন্তু ছেলেটাকে তোরা এমন অসাবধানে ফেলে দিলি, ভেসে ভেসে শেষটা চড়ায় এসে আটকাল। কাকে-শকুনে ভিড় করেছে দেখে থাকতে পারলাম না, তুলে আবার মাঝনদীতে ফেলে দিয়ে এলাম। বামুন-মানুষকে দিয়ে শেষটা মড়া ফেলিয়ে ছাড়লি, হ্যাঁ রে ছবির মা ?

বুড়ো ছবির মা আঁচলে চোখ ঢাকল।

সেদিন সন্ধ্যায় কলিকাতায় কিসের একটা সভা—শরৎচন্দ্র সভাপতি। খাওয়াদাওয়ার পর ক'জনে রওনা হয়েছি, দেউলটি এসে ট্রেন ধরতে হবে।

দাদাঠাকুর!

সর্বনাশ, পিছনে ডাক। তুলসীবাবু সভয়ে বললেন, বিপদ-আপদ না হলে বাঁচি।

শরৎচন্দ্র বললেন, ঘটবে বলেই তো ঠেকছে। সভাপতি করেছে, বক্তৃতা না করিয়ে কি ছাড়বে ?

দু-তিনটে লোক ঘাটের দিক দিয়ে রাস্তায় এসে উঠল। একজন হুঙ্কার দিয়ে উঠল: আবার চলেছ কলকাতা ? এই যে বললে আমার বাড়ি পায়ের ধূলো দেবে কাল সকালবেলা—

শরৎচন্দ্র বিব্রত ভাবে বললেন, দেবো। রাত্রেই তো ফিরে আসছি আজ।

লোকটা কিন্তু একবিন্দু প্রত্যয় করে না, ঘাড় নেড়ে বলল, হুঁ, আসতে দিচ্ছে তারা!

বেচারা আমি! আমারই দিকে বারম্বার কটমট করে তাকায়। বোঝা গেল, অপরাধী আমাকে ঠাউরেছে। কলকাতা থেকে এক একটা দুগ্রহ এসে তাদের দাদাঠাকুরকে বাইরে ঠেলে নিয়ে যায়, তারা এটা বরদাস্ত করতে পারে না।

শরৎচন্দ্র বলতে লাগলেন, খেয়াল রেখো তুলসী, তাড়াতাড়ি যদি সভার কাজ চুকে যায়, আজকেই ফিরতে হবে কিন্তু।

তারপর ঐ চাষাভুষোদের কথাই চলল। তারা জানে না, তাদের দাদাঠাকুরের অপর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। সভাপতিত্ব উপলক্ষে যারা এসে শরৎচন্দ্রকে গ্রাম থেকে নিয়ে যায়, তাদের উপর বিষম রাগ। হাসিমুখে শরৎচন্দ্র বললেন, একদিন কিন্তু সত্যি সত্যি আমার বড় দুঃখ হয়েছিল। একখানা টেলিগ্রাম এসেছে, সেটা পড়াবার জন্য ছুটোছুটি পড়ে গেছে। এমন কি মাইল দেড়েক গিয়ে ভিন্ন গ্রাম থেকে পড়িয়ে আনবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি সেইখানটায় বসে। অথচ এতগুলোর মধ্যে একটা লোকেরও মনে এ কথাটা জাগল না যে টেলিগ্রাম পড়বার মতো ইংরেজি-বিদ্যে দাদাঠাকুরের থাকলেও থাকতে পারে।

সকাল বেলাকার সেই ছবি-মেয়েটির প্রসঙ্গ উঠল। মেয়েটি কুলীন জাতের নয়। বছর আষ্টেক বয়সে বিয়ে হয়। পতি পিতামহকল্প—অন্তত বয়সের দিক দিয়ে। সত্বরই পরমাগতি লাভ করলেন। রইল মেয়েটা আর তার অটুট যৌবন। সম্প্রতি ঘরের চাল কেটে মেয়ে ও মাকে পাড়ার মধ্য থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে, তারা নাকি কোন কোন সমাজমণির বংশদুলালকে খারাপ করেছে। সেই দুলালেরা যে পাড়ার বাইরের পথ না চেনেন এমন নয়। বিপন্ন মা-মেয়ের দিন কাটছিল দাদাঠাকুরের দয়ায়। মেয়েটির অনেক দুঃখের ধন একটি ছেলে—সেটি আগের দিন মারা গেছে। দাহ করবার লোক জোটেনি, মা আর মেয়ে কোন রকমে মড়া বয়ে এনে ফেলে দিয়েছিল রূপনারায়ণের চরে।

সেই ছবি এবং তার মা আজ কোথায় কেমন আছে জানিনে। দাদাঠাকুরের বিয়োগ-ব্যথা কি ভাবে নিয়েছে তারা? আমাদের কাছে শরৎচন্দ্র বেঁচে আছেন তাঁর চিরজীবী সাহিত্যের ভিতর দিয়ে—তাদের তো কিছুই রইল না।

সেকালে দেশে অন্নের অভাব ছিল না, হৃদয়েরও ছিল তেমনি

অবাধ প্রাচুর্য। জ্ঞাতি-বন্ধু আপন-পর নিয়ে সুবৃহৎ সংসার— অগুনতি ঘর, বাড়িতে অতিথি এলে ঘরের গোলকধাঁধা ভেদ করে সে বেচারা আর বেরোবারই পথ পেত না। আর কষ্টেসৃষ্টে পথ যদি বা মিলল, গৃহকর্তা আগলে এসে দাঁড়ালেন: না হে, এত বেলায় আর যায় না—চলো, চলো, চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসিগে। আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্র সেই মজলিসি জাতের শেষ বংশধর। বিংশ শতাব্দীর কর্মব্যস্ত মানুষ আমরা—কিন্তু তাঁর কাছে গেলে সাধ্য কি যে উঠে আসি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লঘুপক্ষ পাখির মতো উড়ে পালাচ্ছে— কাজের ক্ষতি হচ্ছে, মন ব্যস্ত, তবু বসে থাকতে হবেই। কত গল্প—নিজের সম্বন্ধে, আশেপাশে দশজনের সম্বন্ধে, সাধারণ-অসাধারণ কত কি কাহিনী!

একদিন তাঁকে বলেছিলাম, আপনার গল্প মগ্ন হয়ে শুনি, কিন্তু বিশ্বাস করিনে। মিথ্যে, ফাঁকি—আপনি বানিয়ে বানিয়ে বলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন, জীবনটাই তো ফাঁকি দিয়ে কাটিয়ে গেলাম ভাই। তোমরা সব ইস্কুল-কলেজে কত খাটনি খেটে পড়াশোনা করেছ, সে সময়টা আমি ফাঁকি দিয়ে তামাক খেয়ে কাটিয়েছি। তারপর সারা জীবন মিথ্যেকথা লিখে লিখেই এত ভালবাসা কুড়িয়ে পেলাম।

আর একদিন বলেছিলেন, আমার লেখার মধ্যে সবাই আমাকে খোঁজে। কেউ বলে আমি গোঁড়া হিন্দু, কেউ বলে আমি নাস্তিক। কেউ বলে 'চরিত্রহীন' বইটায় আমার নিজের কথা লেখা রয়েছে, কেউ বলে 'শ্রীকান্ত' আমার আত্মজীবনী। আমায় নিয়ে তর্কাতর্কি চলে, দূরে দাঁড়িয়ে আমি হাসি।

আমি বললাম, মায়াবী আপনি। চরিত্রগুলো এমন জীবন্ত করে এঁকেছেন যে মিথ্যে বলে কেউ মানতে চায় না।

একটুখানি ভেবে নিয়ে তিনি বললেন, মিথ্যেও হয়তো তারা নয়। জীবনে কত দেখলাম, কত রকম মানুষের সঙ্গে মিশেছি।

লিখবার সময় সেই সব মানুষের মনের মধ্যে ডুব দিয়ে বসি। তখন আর সম্বিত থাকে না।

মনের মধ্যে আসন জুড়ে বসবার শক্তি যে তাঁর কত বড়, সমগ্র দেশের মানুষ তার সাক্ষ্য দেবে। শিল্পী শরৎচন্দ্রের কোন দিন মৃত্যু হবে না, কিন্তু মানুষ শরৎচন্দ্রের সঙ্গ যারা চিরদিনের মতো হারাল তাদের দুঃখের পরিসীমা নেই।

দুই স্মৃতি

শরৎ-বন্দনা। তখনকার দিনের গণ্যমান্যেরা উদ্যোক্তা। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি। টাউনহলে খুব ঘটা করে শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে। কর্তাদের পিছনে পিছনে আমরা আছি। শরৎচন্দ্র চেনেন আমাকেও—সামান্য-সাধারণ অনেককেই তিনি চিনতেন। পরিষদের পরিমণ্ডল গড়ে মানুষ থেকে আলাদা হয়ে থাকা তিনি পছন্দ করতেন না।

লোকারণ্য টাউনহলে। সেদিন আবার হিজলি-দিবস। হিজলি বন্দীশালার ঐ তারিখে বীর সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনকে গুলি করে মেরেছিল ইংরেজের চেলাচামুণ্ডারা। নিষ্ঠুর অত্যাচারের স্মৃতিময় জাতীয় দিবস।

শরৎচন্দ্র টাউনহলে ঢুকতে যাচ্ছেন, ছেলেরা পথ আটকাল: এমন শোকের দিনে আপনি উৎসব করতে যাচ্ছেন কেন?

শরৎচন্দ্র দাঁড়ালেন। আমি অনতিদূরে—স্বচক্ষে সমস্ত দেখছি। শরৎচন্দ্র বললেন, জন্মদিন বলেই ওরা উৎসবের তারিখ ঠিক করেছে। জন্মানোয় আমার তো হাত ছিল না। হিজলির দুর্ঘটনাও হয়নি তখন।

আবার তিনি গাড়িতে উঠে বসলেন। যজ্ঞ পণ্ড।

কোথায় চলে গেলেন, বড়রা খোঁজ পেয়েছিলেন হয়তো। বেহালায় মণীন্দ্র রায়ের বাড়ি শরৎচন্দ্রের আস্তানা। সেইখানে গিয়েছি আমি। আরও দু-চার জন ছিলেন, নাম মনে পড়ছে না। শরৎচন্দ্র আর ফেরেন না। রায়-বাড়ির লোকেরাও উদ্বিগ্ন।

অনেক রাত্রে অবশেষে ফিরলেন।

কোনখানে নিরুদ্দেশ হলেন, সকলে ভেবে সারা।

শরৎচন্দ্র বললেন, বাড়ি এসে চুপচাপ বসতে ইচ্ছে হল না। কী করা যায়! ভাবলাম, জোড়াসাঁকোয় রবিবাবুর কাছে যাই। সেখানে গল্পসল্প হচ্ছিল এতক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, দেখ শরৎ, তোমার জীবন সম্বন্ধে লোকের বড় কৌতূহল। আমার 'জীবন স্মৃতি' সকলে আনন্দ করে পড়ে। তুমিও লেখো তেমনি।

শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন, আমার জীবন তো ভাল নয় আপনার মতন। সে সব জিনিস লেখা যায় না।

একটু থেমে আবার বললেন, আগে তো জানিনে এত বড় হব। তা হলে সেই রকম মাপজোখ করে চলতাম।

এ গল্প আমি শরৎচন্দ্রের নিজ মুখে শুনেছি। শরৎ-বন্দনার অধিবেশন পণ্ড হল—সেই রাত্রে। মণীন্দ্র রায় মশায়ের বৈঠকখানায়।

* * *

দীনেশ সেন মশায়কে নিয়ে একটি ঘটনা মনে পড়ছে।

তিনি তখন 'বৃহৎ বঙ্গ' নামে বাঙালি জাতির সুরম্য সুবৃহৎ ইতিহাস লিখছেন। বাংলার লোক-সাহিত্য, লোকশিল্প ও লোক-সংস্কৃতি নিয়ে সেই বয়সটায় আমার বড় উৎসাহ। 'পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি' স্থাপিত হয়েছে—গুরুসদয় দত্ত মশায় সভাপতি,

জসীমউদ্দিন ও আমি যুগ্ম-সম্পাদক। বাংলার আসল চেহারাটা দেখবার জন্য গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াই অনেক সময়।

সেন মশায়কে আমি খবর দিলাম, কালীঘাটের নোংরা দুর্গম বস্তির মধ্যে এক দরিদ্র পটুয়ার কাছে পুরানো দিনের দুষ্প্রাপ্য কয়েকখানা পট আছে। দীনেশচন্দ্র বললেন, তুমি নিয়ে চলো আমায় সেই জায়গায়। জিনিসগুলো একবার দেখে আসব।

যথানির্দেশ এক দুপুরে বেহালায় সেন মশায়ের বাড়ি গিয়েছি। আমায় সঙ্গে নিয়ে নিজস্ব ঘোড়ার-গাড়িতে বেহালা থেকে বেরোলেন। ইউনিভার্সিটিতে বোর্ডের মিটিং, সেখানটা একবার ঘুরে যেতে হবে—এই মিনিট পনেরোর ব্যাপার। দু-জনে তারপর কালীঘাট চলে আসব।

দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর দোতলার বারাণ্ডায় দাঁড় করিয়ে রেখে 'আসছি' বলে দীনেশচন্দ্র মীটিঙের ঘরে ঢুকে গেলেন। পনের মিনিটের জায়গায় ঘণ্টা পুরে গেল, দেখা নেই। আরও কয়েকটা জরুরি কাজ রয়েছে আমার—দেরির জন্য ছটফট করছি। কিন্তু বাংলা দেশের প্রতি একান্ত প্রীতিপ্রবণ তিনি, মানুষটিকে বড় শ্রদ্ধা করি—তাঁকে ফেলে চলে যেতে পারছি নে।

অবশেষে বেরোলেন। প্রায় দু-ঘণ্টা কেটেছে। বললাম, পনের মিনিটের কথা বলে দাঁড় করিয়ে গেলেন—

দীনেশচন্দ্র বোমার মতো ফেটে পড়লেন : যাও, শ্যামাপ্রসাদকে বলোগে।

সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছি। শ্যামাপ্রসাদের শিক্ষক তিনি, বড় আনন্দের সম্পর্ক দুয়ের মধ্যে। এ ব্যাপার নিয়ে শ্যামাপ্রসাদকে কী বলতে হবে, বুঝতে পারিনে।

বলছেন, কাজকর্ম আর কিছু হবে না। হবার উপায় নেই। শ্যামাপ্রসাদের জন্যে।

জিনিসটা আরও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। য়্যুনিভার্সিটির কাজ শ্যামাপ্রসাদ পণ্ড করছেন, কেমন করে হয়?

দীনেশচন্দ্র বলে যাচ্ছেন, আগে নিয়ম ছিল, মেম্বাররা যা-কিছু বলবেন ইংরেজিতে। পারত পক্ষে কেউ মুখ খুলত না গ্রামার ভুল হবার ভয়ে। শ্যামাপ্রসাদ নিয়ম করে দিলেন, বাংলাতেও বলা চলবে। এবারে জো পেয়ে গেছে। আজেবাজে তর্ক— নানান কায়দায় বিদ্যে জাহির করা। যা মিনিট পনেরোয় হয়ে যায়, তার জন্য দু-ঘণ্টা লাগিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি কাজ করতে হয় তো আবার সেই পুরানো নিয়ম বহাল হোক। কথাবার্তা লেখাজোখা যা-কিছু সমস্ত ইংরেজিতে।

শ্যামাপ্রসাদের কাছে একদিন এই কাহিনী বলেছিলাম। হাসাহাসি হল।

শিয়রে স্তব্ধ আসিয়া দাঁড়ালে

মুখোমুখি শুধু চাঁদ ও ধরণী নিশিরাতে নির্বাক
হোথা গাঙ আর আবছায়া পথ। ঘুমন্ত বধূ পাশে।
ঘুম ভেঙে গেল। হঠাৎ শব্দ আসে—
কোন্ বন হতে ছুটে আসিছে কি ক্ষেপা হাতি লাথে লাথ?
বাঁধ ভেঙে যেন বন্যা আসিয়া আছাড়ে বন্ধ দ্বারে—
রাত্রি ফাঁড়িয়া কোথা হীরা সিং দূর পথ আঁধিয়ারে
'রেডি' বলে দেয় হাঁক।
জেগে দেখিলাম, তুমি আসিয়াছ; আসিয়া নির্নিমিখ
শিয়রে স্তব্ধ দাঁড়ায়ে রয়েছ। ঘুমন্ত চারিদিক।

স্বপ্ন-শিয়রে দীপ কাঁপে, আর নীলাকাশে কাঁপে চাঁদ।
চাঁদে ঝলমল তব চুল উড়ে। নিঃসাড়ে রাত বাড়ে।

বাহিরে ওদিকে জানালার ধারে
গাঙে পাড় ভাঙে। হাঁকে হীরাসিং। মহাকাল উন্মাদ।
তুমি কি বুলালে মায়া-অঞ্জন আমার দু'চোখ ভরি—
দেখি এলোচুলে গাঙ-পারে এক বিষাদিনী মরি মরি!
হীরাসিং হোথা হাঁকে সেই সংবাদ।

কি মায়া ছড়ালে! সারা বাংলার নদী মাঠ বাট গ্রাম
এক প্রতিমার রূপে দাঁড়াইল, অপরূপ হেরিলাম।
দুর্গম পথ দাবী জানাইছে, চঞ্চল কুতূহলী
প্রাণ-পাখী উড়ে উছলি অন্ধকার।
হায় চঞ্চল পাথে যে জড়ালো আলুলিত কেশভার—
ঘুমাইছে প্রিয়া, নিশিরাতে পাশে ঘুমায় পদ্মকলি।
তুমি চুপি চুপি কি মায়া বুলালে, মাখালে চোখে কি সোনা
আমি দেখিতেছি—দেখি আর দেখি—দেখে সাধ মিটিল না
এত রূপ ফোটে 'পোড়া কাঠ' উজ্জ্বলি!
মাটি ও মানুষ সবি খাঁটি সোনা! বড় বিস্ময় লাগে
ঘরে আর পথে এত ভালবাসা, কে তাহা জানিত আগে?

ঘর আর পথ—মাটি ও মানুষ বিছালো স্বপ্ন-জাল—
আগু গেলে পিছে আকুল অশ্রু জমে
নিশিরাতে আমি থমকি দাঁড়াই ঘর-পথ সঙ্গমে।
ভীরু মনে আজ শত প্রশ্নের ঢেউ ভাঙে উত্তাল।
আঙিনা ঘেরিয়া প্রাণধারাটুকু বেশ তো বহিত খাসা—
মায়াবী, তুমি এ কী মহাজোয়ার আনিলে সর্বনাশা
বাঁধ বেড়া ভেঙে রাখে না অন্তরাল।
শাণিত সত্য আজ মুখোমুখি। স্তম্ভিত বিভাবরী।
আর শিয়রেতে তুমি দাঁড়ায়েছ। তোমারে প্রণাম করি।

বিপুল আড়ম্বরে শরৎ-জয়ন্তীর আয়োজন করা হয়েছিল, যে-কথা এর আগের প্রসঙ্গ 'দুই স্মৃতি'র মধ্যে আছে। তদুপলক্ষে এই কবিতা লিখেছিলাম। তখন খুব কবিতা লিখতাম। 'শরৎ বন্দনা' বইয়ে কবিতাটি ছাপা হয়েছিল, রূপনারায়ণের কূলে সামতাবেড়ের বাড়ির বারাণ্ডায় শরৎচন্দ্রকে আমি পড়ে শুনিয়েছিলাম। তিনি বললেন, বিপ্লবীদের উপর তোমার বড় দরদ, হীরা সিংকে খুব ভাল লেগেছে দেখছি। 'ভুলি নাই' এর অনেক পরে লেখা।

আমি জনৈক শিক্ষক

বিশ বছর আমি শিক্ষক ছিলাম, এক-আধ দিন নয়। কলেজের পড়া সেরেই ঢুকি, বেরিয়ে এলাম তখন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছি। যৌবনের প্রতিটি মধু-ভরা দিন বিগত হয়েছে কলকাতার একটি ইস্কুলের চতুঃসীমার মধ্যে। ছিলাম জনৈক সাধারণ মাস্টার, হেড বা আধা-হেড কিছুই নই। পড়ানো সকলের নিচের ক্লাসে—ধাপে ধাপে সর্বোচ্চ ক্লাসে প্রোমোশন পেলাম। মাইনে চল্লিশে শুরু—বিশ বছর পরে চাকরি ছাড়বার মুখে, তা বিস্তর উন্নতি হয়েছে—আশি ধরো-ধরো করেছি। আরো বিশ বছর টিকে থাকতে পারলে নির্ঘাৎ এক শ'র কাছাকাছি পৌঁছতাম। সতীর্থ অনেকেরই হিংসা—কপাল বটে! চল্লিশ পার হতে না হতে মাইনে আশি। চাকরি ছাড়ছি শুনে বক্রদৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন: মাথা খারাপ হয়েছে, নইলে এত উন্নতি ও এমন বাঁধা-মাইনে কেউ ছেড়ে দেয়!

পিছনে চেয়ে হেসে হেসে বলছি—হাসি দিয়েও কত কান্না কাঁদা যায়, বুঝুন। কলেজে পড়বার সময় ভাবী জীবনের কত স্বপ্ন বুনেছি! সহপাঠীদের ক'জন আজও মাস্টার হয়ে আছেন। লাঞ্ছনা আর নিষ্পেষণের চাপে ন্যুব্জপৃষ্ঠ কুব্জদেহ। ভবিষ্যৎ নেই, বার্ধক্যের সম্বল নেই, বিশ্রামের অবকাশ নেই—নিরুদ্যম গতানুগতিক নিয়মে দিনগত পাপক্ষয় করে যাচ্ছেন। মরে গেছেন জন কয়েক—অদৃষ্ট ভাল, তাড়াতাড়ি মুক্তি পেয়েছেন। ভরসা করি, ওপারে ইস্কুলে নেই—মানুষ-গড়ার সম্মানিত কাজে কেউ জুতে দেবে না।

জলপাইগুড়ি (বানারহাট) জেলা শিক্ষক-সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ থেকে (১২ মে, ১৯৫৬)

সম্মানের পদ—তাই বটে! এক জায়গায় ট্যুইশানি করতাম। কর্তামশায় অতিশয় সদালাপী। পয়সাকড়ির ব্যাপারে যা-ই হোক, দরাজ বিশেষণে কৃপণতা ছিল না। শিক্ষক কি যে-সে ব্যক্তি! আপনারা জাতির সংগঠক। ভাবী-ভারত তাকিয়ে আছে, মহা পবিত্র দায়িত্ব আপনাদের উপর—ইত্যাদি ইত্যাদি। হাওয়া-বদল করতে যাচ্ছেন বাড়িসুদ্ধ, ছাত্রও যাচ্ছে। কর্তা বলছেন, আমি বাইরে থেকে শুনলাম, মাস্টারকে আসতে মানা করে দিই কাল থেকে। চাকরটা নিয়ে যাই—ঠিকে-ঠাকুর আর ঠিকে-মাস্টার রেখে দেওয়া যাবে ওখানে।

তা দুঃখ পেলে হবে কেন? আড়ালে কী বলাবলি হচ্ছে, সে তো আমার শোনবার কথা নয়! কাঞ্চন-কৌলিন্যের যুগ—বিদ্যা-বুদ্ধি ও সদাচার থাকলে কী হবে, নতুন বর্ণাশ্রমে নির্ধনেরা ব্রাত্য। কালোবাজারে লোহা বেচে ধনী হয়েছে, হায় অদৃষ্ট, শিক্ষা-সংস্কারে তারই বুকনি সবচেয়ে জোরালো।

চুপি-চুপি তাহলে বলে ফেলি একটু ঘরের কথা, কিছু মনে করবেন না। আপন-লোক ভেবেই বলছি। অভিভাবকের তাড়নায় আর বয়সের দোষে বিয়ে করে ফেলেছি ঐ মাস্টারির অবস্থায়। তখন কি অতশত ভাবতে পেরেছি! মাসান্তে পয়লা তারিখে মাইনে পাই। বড় দরের ইস্কুল বলে মাইনেটা পয়লাই মেলে। ও-লাইনের দস্তুর নয় কিন্তু সেটা। যাই হোক, টাকাটা পকেটে ফেলে বাড়ি এসেছি। নতুন বউ, দেখি, নোট ক'খানা গুণেগেঁথে তুলে রাখছেন। গণতে অধিক হাঙ্গামা নেই। আমার মুখ শুকিয়ে গেল। শিক্ষিত সুশীল ছেলে দেখে সরলমতি শাশুড়ি কন্যাদান করেছেন, কিন্তু শিক্ষার এই রকম দর বুঝে ফেলে তস্যা কন্যা আর কি মান্য করবেন? তাড়াতাড়ি বলি, মাইনে আমাদের এক তারিখে দেয় না। আজ এই দিয়েছে, আবার দেবে—মাঝে মাঝে নিয়ে আসব। তারপর যেমন যেমন ট্যুইশানির

টাকা পাই, হাতে এনে দিচ্ছি—সবই যেন ইস্কুলের মাইনে। এমনি করে জুড়েগেঁথে যা-হোক এক রকম মান-রক্ষার মতন হল। সমস্ত বলে ফেললাম—দোহাই পাঠক, খবরটা বাড়ির মধ্যে চাউর হয়ে না পড়ে! প্রথম জীবনের জুয়াচুরি ভদ্রমহিলা কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

তাই বলছি, ট্যুইশানিগুলো ভাগ্যিস ছিল, জানে-মানে তাই বেঁচে রয়েছি। কলকাতার শিক্ষক আমাদের ঐ কর্মটা অধিক পরিমাণে করতে হয়। নয়তো শহরের ঠাটবাট বজায় রাখি কী করে? দশ বাড়ির রাই কুড়িয়ে বেল না হোক—সুপারি পরিমাণ জোটাতেই হবে। পয়লা ট্যুইশানি সেরে বেরোচ্ছি, তখনো রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলছে। ছাত্রকে বুঝিয়েছি, শেষরাত্রে মাথা সাফ থাকে—ঐ সময়ে যেটুকু পড়বে, সে-ই হল নিরেট পড়া।

ঘুম ভাঙে না যে মাস্টারমশায়।

বেশ, বাইরের ঘরে শুয়ো তুমি। আমিই এসে দুয়োর ঠেলে ডেকে তুলব।

এমনি ব্যবস্থা না হলে সামাল দিয়ে উঠতে পারিনে যে। সকালে তিনটে সারতে হবে—সমস্ত সেরেসুরে দশটায় বাসায় পৌঁছে এক পলা তেল ও দু-মগ জল মাথায় দিয়ে দশ-পনের গ্রাস ভাত মুখে পুরে ছুটতে ছুটতে ইস্কুলে হাজিরা দেওয়া। ছুটির ঘণ্টা বাজতে না বাজতে এক ঠোঙা তেলে-ভাজা হাতে ছুটেছি ছাত্রের বাড়ি। ঘরে ফিরেছি তখন নিশুতি রাত, রাস্তায় জনমানব নেই। থপ থপ পা ফেলে চিন্তার ভার আর গ্লানির বোঝা বয়ে চলেছি—আর পারি না, ফুটপাথের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে যাই বুঝি বা। যখন পড়াতে যাই গতিবেগে মেলট্রেন হার মানবে, আর পড়িয়ে ফিরে আসি গরুর-গাড়ির অধম হয়ে। ভাগ্যবানেরা গঞ্জনা দেন: সকালে রাত্রে এই করে বেড়াবে আর ঝিমুবে ক্লাসের চেয়ারে বসে বসে। অন্য দেশে দেখ গিয়ে—

আজ্ঞে হ্যাঁ, অন্য দেশও কিছু কিছু দেখেছি বই কি! ট্যুইশানির রেওয়াজ নেই, সত্যি কথা। ছাত্রদের দরকার হয় না, ইস্কুলে যা পড়াশুনা করে তাই যথেষ্ট। আমরাও চাচ্ছি তো তাই। কেন উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়াব বাড়ি বাড়ি দশ-মনিবের মন জুগিয়ে? ব্যবস্থা করো, সুযোগ দাও—কচি কচি শিশুগুলি মনের মতন করে গড়ে তুলি। কী তৃপ্তি, কী আনন্দ! নিষ্পাপ পবিত্র ফুল হয়ে সব ফুটে উঠেছে, ফুলে ফুলে সারা দেশ ভরে গেল! আমাদেরও জীবন আছে, অপর দশজনের মতো আনন্দলিপ্সু আমরাও। বরঞ্চ শিক্ষা ও ভদ্ররুচি থাকার দরুন অপমান ও বেদনা-বোধ তীব্রতর সামান্য-সাধারণের চেয়ে। পারিবারিক সঙ্গসুখ চাই আমরা, পুত্রকলত্র নিয়ে থাকতে চাই সন্ধ্যাবেলাটা। শান্তি চাই, সোয়াস্তি চাই ঘানি-ঘোরানো বলদবৃত্তি থেকে। কারা বঞ্চনা করল আমাদের—কেন, কোন্ অপরাধে?

আমি যখন শিক্ষক ছিলাম, তখনকার এই ছবি। ঘন তমিস্রার মধ্যে প্রত্যাশা ছিল, প্রভাতের অভ্যুদয় হবে অচিরে। স্বাধীন ভারতে সম্মানিত হবেন শিক্ষককুল। দেশি লোকে রাজ্য চালনা করবেন—এই শিক্ষকসম্প্রদায়ের কাছেই পড়েশুনে যাঁরা মানুষ। (সত্যি কি তাই—মন্ত্রী হতে পড়াশুনো লাগে?) স্বাধীনতার কর্মী হিসাবে শিক্ষক আমরা কারো চেয়ে পিছিয়ে ছিলাম না। এই বাংলা দেশের কথা বলি—শত শত সর্বত্যাগী ছেলেমেয়ে মুক্তি-সংগ্রামে আত্মদান করেছে, তাদের গড়ে তুললাম আমরাই। নিরন্ন নিজেরা, শতেক সমস্যায় জর্জরিত—ছাত্রদের তবু বীর্যে আত্মবিশ্বাসে চারিত্রিক দৃঢ়তায় উদ্বুদ্ধ করেছি।

আমার এক শিক্ষকমশায় ছিলেন—তখনকার দিনে 'ইংল্যাণ্ডস্ ওয়ার্কস্ ইন ইণ্ডিয়া' নামে একখানা বই পড়ানো হত—ইংরেজ অধঃপতিত আধা-অসভ্য ভারতীয়দের উদ্ধার করে অশেষ সুখ-সৌভাগ্য দান করেছে, এই ছিল বইটির বক্তব্য। শিক্ষকমশায়

পড়াতেন—পড়িয়ে শেষটা বলতেন, এগজামিন পাশের জন্য লাগবে —শিখে নাও ভাল করে এই সমস্ত। কিন্তু সমস্ত ধাপ্পাবাজি। তার পরে আসল ইতিহাস পড়ানো শুরু হত। কথার মধ্যে জ্বলন্ত বহ্নি। সেই বহ্নিজ্বালা ধরিয়ে দিতেন প্রতিটি কিশোরের মনে। শিক্ষক এমনধারা একজন দু-জন নয়। সুদূর গ্রাম অঞ্চল অবধি শত শত ছড়িয়ে ছিলেন। সি.আই.ডি.-র শ্যেনচক্ষুর আড়ালে অবহেলিত অসম্মানিত দ্রোণাচার্যেরা অগণিত বীর শিষ্য গড়ে তুললেন, 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' যাদের কাছে, ফাঁসির রজ্জু ফুলের মালা, প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে হাসতে হাসতে অবহেলায় যারা ছুঁড়ে দেয়।

তাদের আত্মদানের পুণ্যে দেশ স্বাধীন হল, গদিতে বসলেন আমাদের ভাই-ব্রাদারেরা। শিক্ষক-জীবন ছেড়ে দিয়ে তখন আমি সাহিত্য নিয়ে আছি। জানি যে, দেশি সরকারের আমলে শিক্ষা ও শিক্ষকের সকল দুর্গতির মোচন হয়ে গেছে। হঠাৎ দেখা গেল, রাজভবনের সামনে সদর-রাস্তার উপরে শিক্ষকমশায়রা বসে পড়েছেন। সে কী দৃশ্য! স্বদেশ-বিদেশে কত ব্যাপারই দেখেছি, কিন্তু শ্রদ্ধার্হ সমাজের অত লাঞ্ছনা আর দেখব না। অবহেলিতের অমন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ও আর দেখব না। দিন যাচ্ছে রাত্রি যাচ্ছে, মাথায় খররৌদ্র আর বৃষ্টির পশলা—হাজারে হাজারে বসেই আছেন তাঁরা। পথের মানুষ কেঁদে বাঁচে না। ঘরের মানুষ বেরিয়ে আসে পথের উপরে নৈমিষারণ্যের ঋষিসভা বসেছে, তাই দেখে দু-চোখ সার্থক করবার জন্য। যার যা আছে, এনে দিচ্ছে শিক্ষা-গুরুদের পদতলে।

এক পুলিশ পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল: আমায় চিনতে পারেন মাস্টারমশাই?

না বাবা। সাজপোশাকে মূর্তিমান দম্ভ হয়ে গটমট করে ঘুরছ—পথের ধুলো থেকে অত উঁচু অবধি নজর চলে না তো।

আপনার ছাত্র ছিলাম। পড়া পারতাম না, বজ্জাতি করতাম। অনেক পিটেছেন আমায়।

এককালে আমরাও ছাত্র ছিলাম। পড়াশুনো করতাম, শাস্ত সুচরিত্র ছিলাম। মহৎ বৃত্তি জেনে মাস্টার হয়েছি। মওকা পেয়েছ বাবা, ছাড়বে কেন, তোমরাও পিটাও।

স্বচ্ছন্দ সুখীজনেরা বিস্তর নিন্দা করছেন: কুলিমজুরের মতো শিক্ষকরা ধর্মঘট করলেন—ছি-ছি-ছি—কলির ষোলকলা পূর্ণ হতে বাকি রইল না আর। অর্থাৎ ঘরের চার-দেয়ালের অন্ধকারে নিঃশব্দে মরে গিয়ে মহৎবৃত্তির মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখলেন না কেন তাঁরা? শিক্ষায় ও চরিত্রে এই শিক্ষকদের পদতলে বসবার যাদের যোগ্যতা নেই—রাজনৈতিক শাঠ্যে দেশের মধ্যে মাতব্বর হয়ে বিচরণ করছে, অনুযোগটা আসে প্রধানত তাদের কাছ থেকেই। নির্বিষ ঢোঁড়া জেনে নিশ্চিন্ত ছিল, ফণা তুলতে দেখে আঁতকে উঠেছে।

অথচ ঠিক উল্টো রকমই হবার কথা। দেশের স্বার্থ এবং সরকারের পরিকল্পনা-সাফল্যের জন্য শিক্ষক-ছাত্রের উদ্যমশীলতা ও তুষ্টির প্রয়োজন। ১৯৫২ অব্দের শেষে আমি চীনে গিয়েছিলাম। চীন ছিল আমাদের চেয়েও বেশি দরিদ্র ও নির্যাতনক্লিষ্ট। পিকিনে এক ভারতীয় ব্যবসায়ী আছেন—আমেরিকান সিল্ক বেচে প্রচুর লাভ করতেন, প্রচুর কালোবাজারি চলত। এখন বন্ধ হয়ে গিয়ে নতুন কম্যুনিস্ট-শাসনতন্ত্রের উপর বিষম খাপ্পা তিনি। জাতভাই বলে আমাদের কাছে মন খুলে বলতেন। ভিতরের খবর জানবার জন্য আমরাও মেলামেশা করতাম। নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, কী আর হবে! চিয়াং কাইশেককে অগুন্তি সৈন্য ও অস্ত্র সহ যদি এখানে নামিয়ে দিয়ে যায়, তা হলেও এরা উৎখাত হবে না। ভারি সেয়ানা, আসল ঘাঁটিগুলো হাত করে ফেলেছে। ছাত্র-ছাত্রী আর তাদের শিক্ষকেরা নতুন সরকারের নামে পাগল।

বই-মাইনে সমস্ত সরকার থেকে দেয়, অভিভাবকের এক পয়সাও লাগে না। একটুকু ভাল করলেই স্কলারশিপ।

সেই গোড়ার আমলের কথাও হয়েছিল ব্যবসায়ীমশায়ের সঙ্গে। দারুণ ইনফ্লেশন—রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়বার দাখিল। কিন্তু মাস্টারমশায়দের তখনও রেখেছে তুলোর বাক্সে সযতনে আঙুর রাখার মতো। মাইনে দেয় কতক খাদ্যবস্তু ও কাপড়-চোপড়ে, আর কতক নগদ ইউয়ানে। জিনিসপত্রের দর উঠা-নামা করছে, সময়ে সময়ে একেবারে অমিল। ছেলে-মেয়ে গড়ে তুলবেন শিক্ষকেরা—এত বড় দায়িত্ব যাঁদের উপর, অন্নবস্ত্রের সমস্যা থেকে সেই মহাশিল্পীরা নিরুদ্বেগ থেকে যাতে পূর্ণোদ্যমে কাজ করে যেতে পারেন।

প্রায় সকল শ্রেণীর সমাজকর্মীর জন্য এইপ্রকার ব্যবস্থা—জাতীয় পরিকল্পনা যাঁরা সফল করে তুলবেন। এখন ইনফ্লেশন পুরোপুরি সামলে নিয়েছে, জিনিসপত্র মেলে, দরও বাঁধা। মাইনে এখন শুধু ইউয়ানেই—খাদ্যবস্ত্র দেওয়া হয় না, প্রয়োজনও নেই। ব্যবস্থার ফলও ফলেছে আশ্চর্য রকম—সে-ই তৃতীয় বৎসরেই দেখে এসেছি। ইস্কুলে গিয়ে খবর নিলাম, ট্যুইশানি করে বেড়াতে হয় না কোন শিক্ষককে। ও রেওয়াজ নেই—ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে যা শেখে, তাই যথেষ্ট। রুটিন দেখলাম—শুধুমাত্র পড়ানো নয়, প্রতিদিন শিক্ষকমশায়রা কার্যক্রম ও কাজের ফলাফল বিবেচনা করবার জন্য একত্র বসেন। দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। কত শীঘ্র কী কৌশলে অশিক্ষা দূর করা যায়, তারই জন্য ব্যাকুলতা। কর্তার হুকুম পালন করে দায় সারা নয়, দেশ-পরিগঠনে তাঁরাও দায়িত্বশীল কর্মী—এই চেতনা শিক্ষকদের মনে মনে।

রাশিয়া ও মধ্য-এশিয়াতেও ঘুরেছি। তাজিকিস্তান উজবেকিস্তান কিরঘিজিয়া ইত্যাদি আমাদের ঘরের দুয়োরের

প্রতিবেশী —আফগানিস্তান ছেড়ে হিন্দুকুশটা পার হলেই ঐসব এলাকা। বিশেষ করে এই দিকটায় ঘুরেছি আমি। শিক্ষার ব্যাপকতা দেখে তাজ্জব। পিছিয়ে-পড়া দেশ—এই কিছুকাল আগে শতকরা দেড়-জন দু-জনের মাত্র অক্ষর-পরিচয় ছিল। তা-ও সুর করে কোরানের কয়েকটা বয়েত পড়ত মাত্র। আর এখন যেখানে যাই, নিরক্ষরতা নেই। যাবতীয় শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে—শিক্ষার প্রথম পর্বে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কিছু শিখতে হয় না। মাতৃভাষা যত দরিদ্রই হোক, রাষ্ট্র সর্বাত্মক চেষ্টা করছে তার উন্নতি-বিধানের জন্য। কয়েকটা ভাষার লিপি পর্যন্ত ছিল না, সেখানে লিপির ব্যবস্থা হয়েছে। দুর্বল বলে ভাষার অবলুপ্তি ঘটিয়ে সোবিয়েত দেশে ঐক্য আনবার মূঢ় চেষ্টা হয় নি।

স্বাস্থ্য লাবণ্য বুদ্ধির দীপ্তি ও প্রাণোচ্ছলতায় ঝলমল করে সোবিয়েত ছেলেমেয়েরা। আপন-লোক আপনারা—তা খুলেই বলছি, হিংসা হত আমার। শিক্ষা বলতে ওরা বুঝে নিয়েছে জীবনকে পরিপূর্ণ করে গড়ে তোলা। আঁটোসাটো ঘরের ভিতর খান কয়েক বইয়ের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকা নয়। তিন বছর বয়স অবধি নার্সারি। তিন থেকে সাত কিণ্ডারগার্টেন। সাত থেকে সতেরো ইস্কুল।

লাখ লাখ ছেলেমেয়ে নার্সারিতে পড়ে। অত বড় সোবিয়েত দেশের সকল অঞ্চলে নার্সারি ছড়ানো। নার্সারির মধ্যে শিশু-কোরক ফুল হয়ে ফোটে। মা কাজকর্মে যাচ্ছে, নার্সারিতে বাচ্চা রেখে যায়। নার্সারি তা হলে হল দ্বিতীয়-মা। এই দ্বিতীয়-মা দিনের বেলা কাজের সময়ের, আসল-মা রাত্রিবেলা ঘুমানোর। দ্বিতীয়-মা দেখে, যাতে শরীর গড়ে ওঠে শিশুর, সে হাসিস্ফূর্তিতে থাকে। যা স্বভাবক্রমে শেখা যায়, তাই শুধু শেখায় নার্সারিতে। এখানেই শেষ নয়—নার্সারির কর্মীরা বাড়ি গিয়ে দেখে আসে, বাচ্চা

কেমন অবস্থায় থাকে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা করে আসে।

এখানকার মা শিউরে উঠবেন—কনকনে হিম, বরফগুঁড়ি পড়ছে, তারই মধ্যে খোলা জায়গায় বাচ্চাদের রেখে দিয়েছে। গরম পোশাকে আপাদমস্তক প্যাক-করা—চোখ দুটো এবং নাকটা শুধু খোলা। এমনি করে তাদের শীত-সহনক্ষম করে তোলে। একটু বড়রা—গোলাপফুলের মতো গাল—দেখতে পাবেন, মাটির উপর জাপটে বসে খেলাধুলোয় মেতে আছে। ফাঁকায় থাকা সব চেয়ে বেশি দরকার শিশু-স্বাস্থ্যের পক্ষে।

রঙের খেলা নার্সারিতে। দেয়ালে নানান রঙ, খেলনায় বিচিত্র রঙের বাহার। রঙ দেখতে দেখতে জীবনও নাকি রঙিন হয়ে ওঠে। যাকে আমরা বলি পড়ানো—নার্সারি-কর্মীরা তা কখনো করে না। কথা বলে তারা শিশুদের সঙ্গে—গল্প করে, হাসায়। দু-একটা শিশু গম্ভীর মনমরা ছিল, দু-পাঁচ দিনে তারা হাসি-স্ফূর্তি ছুটোছুটিতে মেতে ওঠে। গ্রীষ্মের সময়টা নার্সারিগুলো গাঁয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়। জায়গা-বদলের ফলে বাচ্চারা স্বাস্থ্যে ভরে ওঠে আরো।

তারপরে কিণ্ডারগার্টেন। সবাইকে এক দলে ফেলে শিক্ষা দেওয়া নয়। বয়স, মনের গঠন, স্বাভাবিক প্রবণতা—সকল দিক লক্ষ্য রাখে প্রতিটি শিশুর। মানুষ তারা, এক প্যাটার্নের পুতুল নয়, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে তাদের—এই হল শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ার কথা। পড়া হয়, এই স্তরে, দিনের মধ্যে কুড়ি থেকে চল্লিশ মিনিট—চল্লিশের বেশি কখনো নয়। গ্রীষ্মের সময় শিশুদের গ্রামে নিয়ে যায়—সেখানে মাটি, গাছপালা, পাখি ও জীবজন্তুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রত্যেক নার্সারি ও কিণ্ডারগার্টেন-প্রতিষ্ঠানে অভিভাবকের কমিটী আছে—তাঁরা এসে দেখাশুনা করেন, পরামর্শ নেন।

পরের শিক্ষা ইস্কুলে। ইস্কুলের নাম নেই, শুধু নম্বর দিয়ে পরিচয়। অর্থাৎ সবই এক ধাঁচের। আমি বেশি মাইনে দেবো, আমার ছেলেপেলে ভাল শিক্ষা পাবে—এরকম ব্যবস্থা হতে পারবে না। জায়গা হিসাব করে ইস্কুল—এই চৌহদ্দির ভিতরের সব ছেলেমেয়ে অমুক নম্বর ইস্কুলে পড়বে। অভিভাবকদের পদপ্রতিষ্ঠা যে রকমই হোক, শিশুদের মধ্যে বাছবিচার নেই। চাকরানির ছেলে আর অধ্যাপিকার ছেলে একসঙ্গে একই শিক্ষা পাচ্ছে। মাস্টার-মশায়রা প্রতি বছর হিসাব নিয়ে দেখবেন, তাঁদের এলাকায় সাত বছরের উপর সব ছেলেমেয়ে ইস্কুলে আসছে কি না। প্রতিটি শিশু ইস্কুলে আসবে—যদি না আসে, তার জন্য দায়ী হবেন শুধু অভিভাবক নয়, সেই এলাকার ইস্কুল-কর্তৃপক্ষও। সমস্ত সরকারি ইস্কুল, খরচপত্র সরকারের। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য অভিভাবকের এক পয়সা ব্যয় নেই। শিক্ষকেরা সকলেই ট্রেনিং-পাওয়া—তার জন্য বিরাট ব্যবস্থা, বিপুল অর্থব্যয়। ধরে নেওয়া হয়েছে—সাধারণ প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে মেধাসম্পন্ন। যাদের মেধা নেই, তাদের অসুস্থ বলে ধরা হবে। তাদের শিক্ষার জন্য পৃথক্ আয়োজন। কোন ছাত্র পিছিয়ে পড়লে তার দায়িত্ব ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের উপরেও পড়বে। অভিভাবকও দায়ী হবেন, কেন তিনি শিশু-মনে শিক্ষার আগ্রহ সঞ্চার করতে পারেন নি।

সোবিয়েতে এশিয়া ইউরোপ জুড়ে ষোলটা গণতন্ত্র—জীবন-রীতির মধ্যে বিস্তর ফারাক। প্রতিটি গণতন্ত্রের জীবন-রীতি বিচার-বিবেচনা করে শিক্ষানীতি স্থির করা হয়। বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিয়েও সমগ্র সোবিয়েতে শিক্ষার কাঠামো এক—একই পদ্ধতির খানিকটা রকমফের। আঞ্চলিক ভাষায় পড়াশোনার আরম্ভ—চতুর্থ শ্রেণীতে উঠে রুশ-ভাষাটা শিখতে হবে। তার পরের বছর বিদেশি ভাষা শিখতে হবে একটা (ইংরেজি, ফরাসি বা জর্মন)। পঞ্চম শ্রেণী থেকে শুরু করে ছাত্রদের বছরে তিরিশ ঘণ্টা দিতে

হবে বরফ-পরিষ্কার, পুরানো পাঠ্যবই-মেরামত, ইস্কুলের ইলেকট্রিক কাজকর্ম ইত্যাদি হাতের খাটনির ব্যাপারে। পয়সা বাঁচানোর জন্যে নয়, ছাত্র যাতে কোন কাজ হীন মনে না করে। ইস্কুলের মধ্যেই ছাত্র মানসিক শ্রমের সঙ্গে দৈহিক শ্রমও করবে, নিজের কাজ যথাসম্ভব নিজে করবে—এই অভিপ্রায়।

বিহার-পশ্চিমবঙ্গ

ভাষার বিপদ

দুই মুখ্যমন্ত্রী রাজধানীতে বসে দলিলে সই দিয়ে এলেন—বিহার পশ্চিমবঙ্গ দুটো রাজ্য এক হয়ে যাবে। আমি সে সময়টা পূর্ব-পাকিস্তানে—মাইকেল মধুসূদনের জন্মদিনের উৎসবে কবির গ্রাম সাগরদাড়ি গিয়েছি। যশোর থেকে সাতাশ-আঠাশ মাইল দূর, জঙ্গলে ভরা দুর্গম জায়গা। জীপ করে বিস্তর কষ্টে অবশেষে

বাংলাদেশকে খণ্ডিত করে বৃহৎ ভাগটা ভারতের বাইরে চালান করে দিয়েও কর্তারা সোয়াস্তি পেলেন না। ১৯৫৬ অব্দে সিদ্ধান্ত হল, যেটুকু ভারতে আছে সেটা, বিহারের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। বাংলা নামক কোন দেশের নামগন্ধ ভারতে থাকবে না। এবং পৃথিবীতেও নয়—যেহেতু পূর্ববাংলার নাম বদলে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ পূর্ব-পাকিস্তান করেছেন। বাংলার সাহিত্যিকরা কর্তার ইচ্ছায় 'হাঁ' বলে বিবৃতি ছাড়লেন। বিবৃতির বাইরে যাঁরা রইলেন তাঁরা নিতান্তই মুষ্টিমেয় চুনোপুঁটি—অধম যাঁদের একজন। জনমতের তাড়ায় সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত পালটাতে হল—বাঙালির চতুর্দশ পুরুষের ভাগ্য, পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র রাজ্যটি অদ্যাপি পুরাতন সুবৃহৎ বঙ্গের স্মৃতিবহন করছে। সেই সময় দুটো প্রবন্ধ লিখেছিলাম: ভাষার বিপদ (আনন্দবাজার পত্রিকা: ৫ চৈত্র, ১৩৬২) এবং বাংলাভাষার সঙ্কট (যুগান্তর: ১৬ চৈত্র ১৩৬২)। ঐ ধরণের প্রস্তাব যে কোন সময় আবার উঠতে পারে, বাংলাদেশের উপর থেকে শনির দৃষ্টি অপসৃত হয়েছে, এখনো মনে করি নে। সেদিন আমি যদি না থাকি, প্রবন্ধ দুটোর পুনর্মুদ্রণের মধ্যে আমার কথাগুলো রইল।

পৌঁছানো গেল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জোড় খুলে যাবার দাখিল। গিয়ে তাজ্জব। দেশবিদেশে বিস্তর সভা করেছি, এমনটা দেখি নি। মেলা বসে গেছে। আমাদের জীপ যাচ্ছে, তখনই দেখতে পাচ্ছি কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে। খাল-বিল ঝাঁপিয়ে পাঁচ-সাত ক্রোশ পথ হেঁটে আসছে মানুষ। ছই-দেওয়া গরুর গাড়িতে মেয়ে-বউরা আসছে অনেক অনেক দূরের গ্রাম থেকে। জীপ আটকে গেল তো ক্ষেত থেকে চাষীরা ছুটে এসে কোদালি ধরে রাস্তা চৌরস করে দিচ্ছে, জঙ্গল সাফ করছে। কম পক্ষে দশ হাজার মানুষের জমায়েত—তাঁদের পনেরআনা মুসলমান। নিরক্ষর গ্রাম্য চাষী—তাঁরাই চাঁদা দিয়েছেন, উদ্যোগ-আয়োজন করেছেন বাংলা ভাষা ও বাঙালি কবির নামে। আমাদের এত খাতির—সে-ও বাংলা-সাহিত্যের ধ্বজা বয়ে চলেছি বলে।

বছর কয়েক আগে ঢাকা শহরের আর এক সন্ধ্যার কথা ভাবছি। প্রবীণ-তরুণ জনকয়েকের সঙ্গে এক সাহিত্যসভায় বসেছি। অত্যন্ত বিচলিত তাঁরা—মাতৃভাষা বাংলার উপর উর্দু চাপানোর চেষ্টা হচ্ছে, সাহিত্য-আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সেই প্রসঙ্গ উঠছে। বিচলিত হয়েছেন, কিন্তু ভয় পান নি। তরুণেরা মুখের উপর বলে দিলেন, আপনাদের পশ্চিমবঙ্গের কী হবে, ভাবুন গে আপনারা। আমাদের মুখের বুলি কেড়ে নেবে, এতবড় শক্তি কারো নেই।

পরবর্তী ইতিহাস দুনিয়ার মানুষ জানেন। পূর্ব-পাকিস্তানের বড় পুণ্যদিন একুশে ফেব্রুয়ারি। মাতৃভাষার জন্য তরুণেরা রক্ত দিলেন—রক্তমূল্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর তাঁদের দাবির সর্বকালীন প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। দেশে দেশে মুক্তির সংগ্রামে বহু জনে আত্মদান করেছেন, তাঁদের প্রণাম করি। কিন্তু 'বাংলা চাই' বলতে বলতে ভাষার জন্য প্রাণ দেওয়া প্রথম ঐ পূর্ব-বাংলায় দেখা গেল। আর সেই যে সান্ধ্য সভায় আমরা মিলেছিলাম,

তাঁদের মধ্যে একজনের অন্তত প্রাণ গিয়েছে—পরে খবর জেনেছি।

ইলেকশনে মুসলিম-লীগ গদি হারাল। তাই শুধু নয়, পার্টির নামটুকু টিকিয়ে রাখতে গলদ্‌ঘর্ম। বাংলাভাষার উপর হামলা হলে তাঁরা যথোচিত যত্ন নেন নি, এই হল অপরাধ। পৃথিবীতে এমন নীরক্ত বিপ্লব আর ঘটে নি। তারপরেই সাহিত্য-সম্মেলন ডাকলেন ওঁরা। রোজ তিনটে করে অধিবেশন—পাঁচদিন এক নাগাড় চলল। লোকে লোকারণ্য। নিমন্ত্রণ পেয়ে আমরা কয়েকজন গেলাম পশ্চিমবঙ্গ থেকে। রাজনৈতিক বিচ্ছেদ সত্ত্বেও দুই বাংলার ভাষিক ঐক্য বক্তৃতায় বক্তৃতায় প্রকাশ করলেন ওখানকার সাহিত্য-নেতারা। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আসর, নজরুল-সঙ্গীতের আসর। তুলসী লাহিড়ী ও বনফুলের নাটক-নাটিকা এবং মেঘনাদবধ কাব্যের আংশিক অভিনয় হল। একদিনের আসরে 'বাংলাভাষার গান'—বাংলাভাষার মহিমা, ভাষা-আন্দোলন, আন্দোলনে যাঁরা প্রাণ দিলেন তাঁদের নিয়ে গানের পর গান। 'একুশে ফেব্রুয়ারি—ভুলবো না ভুলবো না, ভুলতে কি পারি?' গানের আওয়াজ এখনো কানে বাজে, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়্যা নিতে চায়'—সম্মেলনের আরম্ভ-সঙ্গীত। পনের মিনিট ধরে দীর্ঘ এই গানটা নানান কায়দায় গাওয়া হল। হল-ভরা মানুষের চোখে চোখে জল—চোখে চোখে আগুন। সাহিত্য-সম্মেলন কি, ওটাকে বলব বাংলাভাষার বিজয়োৎসব। বিজয় পরিপূর্ণ হয়েছে এখন। বাংলা পাকিস্তানের অপর রাষ্ট্রভাষা। একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন।

পাকিস্তান-রাষ্ট্রকর্তারা চাচ্ছিলেন, পূর্ব-পশ্চিম দুটো এলাকাই উর্দুর এক জোয়ালে বেঁধে দেবেন। মিলনটা তাতে নিবিড় হয়। খোদ কায়েদে-আজমেরই বাঞ্ছা ছিল তাই। নিঃসংশয়ও ছিলেন তিনি। পাকিস্তান হাসিল হল ইসলামের নামে, সেই নামেই দুই অংশের

এক ভাষা হবে, এ নিয়ে ভাবনার কি ? মানুষের মনে মনে তখন সাম্প্রদায়িকতার বিষ। শান্ত নিরীহ পরম প্রীতিপর মানুষটি, হঠাৎ দেখলেন, জানোয়ার হয়ে গিয়ে ছুরি হানছে প্রতিবেশীর বুকে—অপরাধ, ধর্মটা তার আলাদা।

শক্তিমানের যত রকমের হাতিয়ার থাকে, সমস্ত প্রয়োগ করা হল। বাংলাভাষাটা আদপে হিন্দুদের, সাহিত্যের পনেরআনা লেখক হিন্দু, তোমাদের কী আছে ঐ ভাষা নিয়ে লাফালাফি করবার ? অ-আ ক-খ প্রমুখ প্রতিটি অক্ষর ছদ্মবেশী হিন্দু দেবদেবী, ঐ সমস্ত উচ্চারণ মাত্রেই গুণাহ্ হয়, প্রমাণ-প্রয়োগ সহ এমনি-ধারা বোঝানো হল জনসাধারণকে। শুধু কাঠমোল্লারাই এই কর্মে লাগলেন, তা নয়। চিরজীবন বাংলা সাহিত্যের সেবায় সকলের শ্রদ্ধা-ভালবাসা কুড়িয়েছেন, এমন সাহিত্যিকও দলে ছিলেন। বিহারের সঙ্গে বাংলাদেশ জুড়ে দেওয়ার প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গেও বা আজ কী দেখছি ? অবাক হবার কিছু নেই, সাহিত্যিক হলেও মানুষ বটে তো ! টাকাপয়সা, খাতির-সম্মান, কর্তার পিঠচাপড়ানি সকলে হেলা করতে পারে না।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। খোদ জিন্নাহ্ সাহেব ঢাকায় এসে যখন উর্দুর কথা তুললেন, তাঁরই মুখের উপর লোকে 'না' বলে বসল। জিন্নাহ্ হকচকিয়ে গেলেন। আর সেই উর্দু-সমর্থক সাহিত্যিকটি সাহিত্যসম্মেলনে, দেখলাম, সকলের অপাংক্তেয় হয়ে গেছেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ একবার তাঁর নাম তুললেন তো সভাসুদ্ধ ছি-ছি করে উঠল।

সাম্প্রতিক কালে পূর্ব-পাকিস্তান নতুন করে প্রমাণ করল, ভাষার উপর জবরদস্তি খাটে না। মানুষে মানুষে সব চেয়ে বড় বন্ধন ভাষা। এরই জন্য নানান ভাষাগোষ্ঠী। এই সব ভাষাগোষ্ঠী স্বভাবক্রমে সুদীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠেছে—হিসাবকিতাব করে শাসন-সৌকর্যার্থ কেউ বানায় নি। যেমন, বাংলা দেশের মানুষ

আমার চেহারা পাঞ্জাবের মানুষের থেকে ভিন্ন। এ পার্থক্য মানতেই হবে। কারো ফরমায়েশ মতো যেমন ভাষাগোষ্ঠী গড়ে না, প্রয়োজনের খাতিরে তেমনি ভাষাপার্থক্য ভেঙে ফেলাও সম্ভব নয়। ভাঙতে গেলে অনর্থ ঘটে।

বাংলা-বিহার একীকরণের মধ্যে এই অনর্থ ঘটানোর প্রয়াস। আরে, অনর্থ কি বলো—প্যাঁচে ফেলে আরও চার কোটি লোক এনে দিচ্ছি বাংলাভাষার খপ্পরে। আইন হবে, বিহারীদেরও বাংলা পড়তে হবে—যেমন আমরা পড়ব হিন্দি। এর ফলে ভাষার পরিধি কত বেড়ে যাবে, বোঝ। এমনি সব ছেলে-ভুলানো স্তোক। টুঁটি চেপে পাঠকদল বাড়ানো—শুনেই তো বাংলার সাহিত্যিক আমার আত্মসম্মানে লাগে। হিন্দির উপর রাষ্ট্রভাষার শিলমোহর পড়ছে, প্রতিকার না হলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আজ হোক কিম্বা কাল হোক হিন্দি বাঙালিকে শিখতে হবে। কিন্তু বিহারিরা পাইকারি হারে বাংলা শিখতে যাবেন কেন, কোন্ কাজে লাগবে তাঁদের ? আইন করে শেখানো হবে। কিন্তু আইন করা হয় লোকের উপকারের জন্য। আইনকর্তাদের এক্তিয়ার নেই লোকের ঘাড়ে অনাবশ্যক বোঝা চাপাবার। শিশুরা কি ধোপার গাধা যে পাঠ্য-তালিকায় যা খুশি চাপিয়ে দিলেই হল ? বিহারের নিজস্ব ভাষা পুরোপুরি হিন্দিও নয়। যাঁরা মৈথিলী কিম্বা ভোজপুরী বলেন, তাঁদের কী গতি ? তিনটে ভাষা শিখবেন (এবং ইংরেজি), না মাতৃভাষাটা বাতিল করে দেবেন ? কথা উঠেছে, উড়িষ্যা ও আসামকেও জোড়বার চেষ্টা হবে। তখন তো আরও দুটো ভাষা চাপবে এর উপর। মাতৃভাষাতেই আজ অবধি সকলের অক্ষর-পরিচয়টা করানো গেল না, রাতারাতি ওঁরা একগণ্ডা ভাষায় লায়েক করে তুলতে চান। বিহার থেকেই বেশি আপত্তি ওঠা উচিত। ইতিমধ্যে তার সূচনা দেখা দিয়েছে।

আইনের চাপে যদিই বা বিহারে বাংলা পড়ানো হয়, সেটা

কোন কাজের হবে না। পুরুলিয়া ও অন্যান্য জায়গায় বাংলা-ভাষার যারা শতেক লাঞ্ছনা করছে, রাতারাতি তাদের বাংলা-প্রীতি উথলে উঠবে—কেমন করে বিশ্বাস করি? আপাতত বাংলার ক-ব-ঠ পড়ানো চালু হতে পারে, কিন্তু অচিরে সে ব্যবস্থা বাতিল হবে সন্দেহ নেই। সংস্কৃত আমাদের অবশ্যপঠনীয়, কিন্তু ক'জনে আমরা সংস্কৃতে ধুরন্ধর হচ্ছি, কত বই পড়ছি? ক্লান্তিকর বোঝা হিসাবে বিহারে বঙ্গভাষারও এই গতি হতে বাধ্য।

বিহারের সঙ্গে না হয়ে যদি উড়িষ্যা-বাংলা কিম্বা আসাম-বাংলা একীকরণের কথা হত, তা হলে ভাষার দিক দিয়ে অন্তত শঙ্কিত হতাম না। কারণ ওড়িয়া, আসামি কিংবা বাংলা—কোনটার উপরে রাষ্ট্রের অতিরিক্ত অনুগ্রহ নেই। বঙ্গভাষীর বেশির ভাগ পাকিস্তানে, ভারত রাষ্ট্রে সামান্য অংশই থাকেন। হিন্দিভাষীর সঙ্গে সেই সামান্য সংখ্যকদের জুড়ে গেঁথে দেওয়ার অর্থ, রাষ্ট্রভাষা যাতে অসহায় বঙ্গভাষাকে ধীরেসুস্থে চিবিয়ে চিবিয়ে জীর্ণ করতে পারে তার সুযোগ করে দেওয়া। রাষ্ট্রের ইচ্ছাক্রমে মন্থর গতিতে ভাষা বিলয়প্রাপ্ত হয়েছে, পৃথিবীতে এমন একাধিক নজির আছে। বাংলা যদি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের মাতৃভাষা ভোজপুরীর মতন দরিদ্র ও মুমূর্ষু হত, হিন্দি-কবলিত হবার মুখে বিশেষ ধস্তাধস্তি হত না। কিন্তু বাংলা ভাষার বিস্তর মহিমা—এ ভাষা ও সাহিত্য বাঙালির প্রাণের দোসর। বঙ্গভাষী অগণিত নরনারী সর্বত্যাগ করেছেন এই প্রত্যাশায় যে একদা স্বাধীনতা ও ভাষাভিত্তিক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে—তখন জনসাধারণ রাজ্যের শাসনে ও গঠনে ন্যায্য অংশ নিতে পারবেন। একীকরণ সে পথে কাঁটা দিচ্ছে। আগে ইংরেজিনবিশরা রাজ্য চালাতেন, এখন সে জায়গায় চালাবেন হিন্দিনবিশরা।

নাম থাকবে পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সংযুক্ত রাজ্য (প্রদেশ নয় কিন্তু—রাজ্য। সংবিধান মতে প্রদেশে আর ফিরে যেতে পারছি নে।

সমগ্র ভারতই হল সংযুক্ত রাজ্য—সেই কাঠামোর ভিতর পুনশ্চ এক রাজ্য-সংযোগ)। নামটা থেকে যাচ্ছে যখন, এত ভাবনা কিসের? না বনলে আলাদা হয়ে আসব। এই ধরনের নামকরণ আরও একটা হয়েছিল—'আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ'। কিছুদিন পরে সংক্ষিপিত হয়ে শুধুমাত্র দাঁড়াল 'সংযুক্ত প্রদেশ'। এখন উত্তর-প্রদেশ। সে যাই হোক, আগ্রা ও অযোধ্যা নামে দুটো শহর তবু রয়ে গেছে ভারতভূমির উপর, সেখানে লোক বিচরণ করছে। আমাদের কি? বলতে পারেন, রইল তো বঙ্গোপসাগর—অভাগ্য বাঙালি জাতির সেখানে ডুবে মরা চলবে।

একবার জোটে ঢুকে গিয়ে আবার বেরিয়ে আসা এতই সোজা যেন! বাংলার যে অংশগুলো ইংরেজ বিহার-আসামের শামিল করেছিল, সেখানকার মানুষের বেরিয়ে আসবার জন্য ঐক্যবদ্ধ ঐকান্তিক চেষ্টা, কংগ্রেসের ভূয়োভূয় প্রতিশ্রুতি—এত সমস্ত সত্ত্বেও কত ফ্যাকড়া বেরোচ্ছে, চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি। কে আলাদা করবে আবার, কাদের মত নিয়ে হবে? একীকরণের পর আইন মতে তো একশা হয়ে গেলাম, তখন নিশ্চয় মেজরিটির কথা উঠবে। হাঙ্গামার আগে পাথুরে যুক্তিতে লাভালাভটা ভাল করে খতিয়ে নিতে চাই। ভাল হলে কেন মানুষ বুঝবে না? মানুষকে বিশ্বাস করুন, মানুষের মুখোমুখি দাঁড়ান—যে মানুষ আপনাদের রাষ্ট্রকর্তা করে গদিতে বসিয়েছে।

ভারত এক-রাষ্ট্র সন্দেহ নেই—বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর সমবায়ে এই বিরাট রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিগঠন। ইয়োরোপ পেরে ওঠেনি—ভাষা-গোষ্ঠীগুলো সেখানে প্রায়শ আলাদা রাষ্ট্র হয়ে আছে, তাদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি। এ দিক দিয়ে আমাদের বেশি কৃতিত্ব। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বুঝসমঝ হয়ে ওদের চূড়ায় যদি সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তি বসানো যেতো, ভারতের মতোই হতে পারত তা হলে। সকল ভাষাগোষ্ঠীকে তুলে ধরা রাষ্ট্রসমবায়ের করণীয়,

তাতেই স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি। রোলার চালিয়ে একীকরণ করে নয়।

প্রতিবেশী পূর্ব-বাংলার দৃষ্টান্ত থেকে পাঠ নিন আমাদের কর্তারা। ওপারে যা হয়েছে, এপারেও তেমনি হবে। এস. আর. সি.র রোয়েদাদে বিহার তড়পাচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গও খুশি নয়—সেই আতঙ্কে তাড়াতাড়ি এক গোঁজামিলের বন্দোবস্ত। বোঝাতে গিয়ে এখন আর থই পাচ্ছেন না। কিন্তু মাথার যন্ত্রণা হতে পারে বলেই মস্তিষ্ক-ছেদনের ব্যবস্থা কোন চিকিৎসকই দেবেন না। ডাক্তার বিধান রায় কেবল দিচ্ছেন।

বাংলাভাষার সঙ্কট

যশোর জেলায় আমার জন্ম। সে জায়গা এখন পূর্ব-পাকিস্তানে। বাপপিতামহের ভিটে দেখতে হলে পাশপোর্ট করে যেতে হয়। বর্ডারের কর্তারা তল্পিতল্পা খুলে ছড়িয়ে পরখ করে দেখেন। তখন আমার মনের ভিতর—যাকগে, সে-কথায় কাজ নেই, ভুক্তভোগী ছাড়া মনের অবস্থা কেউ বুঝবেন না।

আবার যা গতিক, বাপ-পিতামহের মুখের বুলি বলতে হলেও হয়তো পাশপোর্ট করে ওদিক পানে যেতে হবে। গোটা বাংলাদেশই যখন পাকিস্তানে ঢুকে যাবার দাখিল, বাঙালি আমরা কোমর বেঁধে লাগলাম বাংলা খণ্ডিত হয়ে খানিকটা যাতে ভারতভূমে থেকে যায়। তখন জানি, পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলাভাষা থাকবে না, বাংলা গিয়ে নির্ঘাৎ উর্দু চালু হবে। ভারতবর্ষের দুই প্রান্তের দুই অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান। ইসলামের নামে আলাদা রাষ্ট্র হল, তার দুই অংশে কিছুতেই ভাষিক অনৈক্য থাকতে দেওয়া হবে না। খোদ জিন্নাহ্-সাহেব চাচ্ছেন—তাঁর ইচ্ছা কে রুখবে?

অতএব পশ্চিমবঙ্গ নামে বঙ্গদেশের খানিকটা যখন এই তরফে ঢুকল, সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললাম। যাক বাবা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালিয়ানার নির্ভয় নীড় মিলেছে। নীড়টা সঙ্কীর্ণ এবং তিনটে টুকরোয় বিভক্ত বটে, কিন্তু এ দশা বেশি দিন নয়। ইংরেজ আক্রোশ বশে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে কেটে এদিক-ওদিক ছুঁড়ে দিয়েছিল, সেগুলো ফিরে পাব অচিরে। চল্লিশ বছর ধরে কংগ্রেস কথা দিয়ে আসছেন, বিহারের নেতারাও বলেছেন—এবারে গদির উপরে জুত করে বসতে যে ক'টা দিন দেরি। আসামে যেমন অসমিয়া, উড়িষ্যায় ওড়িয়া, অন্ধ্রে তেলুগু, মাদ্রাজে তামিল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের যাবতীয় কাজকর্মও তেমনি বাংলাভাষার মারফতে। ভিন্ন ভাষায় বাক্‌সিদ্ধ হবার জন্য মানুষকে আর নাজেহাল হতে হবে না। আত্ম-বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল বাঙালি অপর ভাষাগোষ্ঠীগুলির পাশাপাশি সর্বভারতীয় নাগরিক হয়ে শান্তিতে বসবাস করবে। শুধুমাত্র রাষ্ট্রিক স্বাধীনতাই নয়, এমনি ধরনের ভাষিক স্বাধীনতাও আমাদের চিরকালের স্বপ্ন। স্বাধীন-ভারতে সেই স্বপ্ন সফল হতে চলল।

এখন দেখছি, হিসাব বিলকুল উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির পাশে পাটনার এসেম্বলি এই সেদিন পুরুলিয়ার শ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে মাতৃভাষা বাংলা বলতে দিল না। আর ওদিকে দেখুন, নিখিল-পাকিস্তানের অপর রাষ্ট্রভাষা হয়ে গেল বাংলা। আরবসমুদ্র-কূলে করাচি শহরের মানুষ নতুন করে বাংলা ভাষার পাঠ নিতে শুরু করেছেন। কতরকম বাধাবিপত্তির সঙ্গে যুঝতে হয়েছে পাকিস্তানের বাঙালির! বোঝানো হয়েছে—বাংলা ভাষার লেখক-পাঠকের পনেরআনা হল হিন্দু। যাদের সঙ্গে পৃথক হয়ে আলাদা ইসলামের রাজ্য গড়ছি, তাদের ভাষার তাঁবেদার কেন হতে যাব? এমনও দেখানো হল, অ-আ ক-খ প্রমুখ যাবতীয় অক্ষর ছদ্মবেশী হিন্দু দেবদেবী—উচ্চারণ মাত্রেই ধর্মে

গুণাহ্ হয়। কিন্তু কিছুতে আটকাল না। সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জর মানুষের মন—সেই তখনও কায়েদে আজম জিন্নাহ্র মুখের উপর ঢাকাবাসী স্পষ্টাস্পষ্টি 'না' বলে দিলেন। বাহাদুর বলি পূর্ববাংলার বাঙালিদের—প্রাণ দিয়ে যাঁরা মাতৃভাষার মর্যাদা রেখেছেন।

বিহারী ভাইদেরও বাহাদুরি দিচ্ছি। সেকালের নেতারা কি বলেছেন না বলেছেন জানি নে মশায়, হালফিল এক ইঞ্চি ভুঁইও দেওয়া হবে না বিহার থেকে। সীমা কমিশন বসল। দুই তরফে যথারীতি বিক্রম দেখানো হচ্ছে। নিতান্ত চক্ষুলজ্জার দায়েই কমিশন শেষটা মুষ্টিভিক্ষার সুপারিশ করলেন। রাজধানীর হাইকম্যাণ্ড নিক্তি ধরে তৌল করে কিছু ঘষামাজা কাটছাঁট করলেন তার উপরে। বিহারী বীরেরা তখন হুঙ্কার ছাড়লেন, মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেবো কিন্তু। তারপরে প্রদেশিক সীমা-বিল বেরোল। চোখ কচলে দেখি, পর্বত এতকাল ধরে যে মূষিক প্রসব করেছিল, ডামাডোলের মধ্যে সুড়ুত করে তা পালিয়ে গেছে। তারিফ করতে হবে বইকি বিহারীদের! মরদ কি বাত—যা বলেছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে ছাড়লেন। এক ইঞ্চিও ভুঁই পাচ্ছি নে আপাতত। আমরা পশ্চিমবঙ্গের তরফেও যথেষ্ট তড়পে ছিলাম। তবে বুদ্ধিমান জাতি—অতি-বড় উত্তেজনার মধ্যেও হিসাবজ্ঞান টনটনে থাকে। দরকার মাফিক বীরত্ব দেখালেও সামলে নেবার পথ খোলা রাখি; মন্ত্রিত্ব-ত্যাগ ইত্যাদি গোলমেলে কথা আমরা মুখের আগায় আনি নি।

তা অত ঘাবড়াচ্ছ কেন হে? বঙ্গ-বিহার এক হয়ে সংযুক্ত রাজ্যে হিন্দি-বাংলা দুটো ভাষাই চলবে। আইন করে চালানো হবে। বিহারের চার কোটি লোক এনে দিচ্ছে বাংলা ভাষার খপ্পরে। অতএব লেখকমানুষ উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করো—বেশি লোকে বাংলা শিখবে, বাংলা বই বেশি কাটবে।

যেন আইন করলেই দায় খালাস হয়। হিন্দির কোমরে রাষ্ট্রভাষার চাপড়াশ—সর্বভারতীয় কাজকর্মে অতএব হিন্দি ছাড়া গতি নেই। তার উপর অন্যতম রাজ্যভাষা হিসেবেও ঐ হিন্দি রয়ে যাচ্ছে—রাজ্যের ভিতরের কাজকর্ম হিন্দির মারফতেও চলতে পারবে। অতএব বাড়তি বঙ্গভাষা শিখতে যাবেন বিহারীরা কি জন্য? বিহারীদের মাতৃভাষা, মনে রাখবেন, পুরোপুরি হিন্দি নয়। মৈথিলী, ভোজপুরী, মগাহি—এই সমস্ত। কিন্তু মৈথিলী গোষ্ঠীর কতক ছাড়া মাতৃভাষা নিয়ে অন্য কারো মাথাব্যথা দেখি নে। আইন বলে ঐ চার কোটি রাতারাতি নাকি বঙ্গভাষায় লায়েক হয়ে উঠবেন। তার আগে এই খবরটা দিন তো, চার কোটির মধ্যে হিন্দিটাই ভাল জানা আছে ক'জনের? হিন্দি-সাহিত্যের সমঝদার কি পরিমাণ? বিশিষ্ট হিন্দি লেখক কতজন বিহার রাজ্যে? যে হারে হিন্দি শেখানো হচ্ছে, তাতে চার কোটির শুধুমাত্র অক্ষর-পরিচয়েই কত বছর লাগবে? এই যখন অবস্থা, রাষ্ট্রকর্তাদের কোন্ এক্তিয়ার আছে আবার এক ক্লান্তিকর নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বঙ্গভাষার বোঝা এই রাজ্যের উপর আইন করে চাপানোর?

এবার খাস পশ্চিমবঙ্গে আসুন। এই ব্যবস্থায় আমার-আপনার ছেলেপুলেই বা কতদিন বঙ্গভাষা শিখতে চাইবে? স্বাধীন-ভারতের যে ছক আমরা কেটে রেখেছিলাম, তথায় রাজ্যের যাবতীয় কাজকর্ম মাতৃভাষায়, শুধুমাত্র সর্বভারতীয় ব্যাপারেই রাষ্ট্রভাষা অথবা সংযোজন-ভাষায় প্রচলন। সর্বভারতীয় কাজকর্ম নিয়ে মাথা ঘামাবেন গোণাগণতি কয়েকজন। সহজ ও স্বভাবগত মাতৃভাষার মারফতে জনসাধারণের আত্মবিকাশ ঘটবে; স্বরাজ্যের শাসন ও পরিগঠনে তাঁরা অংশ নেবেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেও যা দাঁড়াচ্ছে—এক হিন্দিটা জেনে নিলেই সর্বভারতীয় কাজ চলে যাবে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কাজও চলতে পারবে। অতএব বঙ্গভাষা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষেও অপ্রয়োজনের ভাষা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গেও

বাংলা শেখার তাগিদ থাকতে পারে না। বাংলা ভাষার ঐশ্বর্যের কথা তুলবেন—কিন্তু সংস্কৃতেরও অপরিমেয় ঐশ্বর্য, আমাদের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য সংস্কৃতের সঙ্গে বিশেষভাবে বিজড়িত। কিন্তু দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগে না বলে সসম্ভ্রমে সংস্কৃতকে পুঁথিগত করে রেখেছি। বাংলা ভাষাকেও সেই অবস্থায় এনে ফেলা হচ্ছে। ইংরেজ সম্পর্কে আমাদের মনোভাব যা-ই হোক, ইংরেজি ভাষা বর্জন কিছুতেই চলবে না। বিজ্ঞান-দাক্ষিণ্যে আজ দূর বলে কিছু নেই—কোন দেশ বিচ্ছিন্ন ও একক হয়ে থাকতে পারবে না দুনিয়ার উপর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজির একান্ত প্রয়োজন। অতএব এই সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে অপ্রয়োজনের ভাষা বাংলা চর্চার ফুরসৎ ক'জনের হবে?

উড়িষ্যা রাজ্যের ভিতর ওড়িয়া একেশ্বর, অন্ধ্রে তেলুগু, মাদ্রাজে তামিল, মহারাষ্ট্রে মারাঠি—এইসব ভাষাগোষ্ঠীর এলাকায় দ্বিতীয় দাবিদার নেই। অভাগ্য বঙ্গভাষাকে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে হিন্দির সঙ্গে। হিন্দি না হয়ে অন্য-কিছু হলে ভাষার দিক দিয়ে অন্তত শঙ্কিত হতাম না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অস্তে আর এক ভয়াবহ বস্তুর আবির্ভাব হয়েছে, তার নাম হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ। কলে-কৌশলে রাষ্ট্রভাষার চাপরাশ পরে তার প্রতাপ দিনকে-দিন সর্বগ্রাসী হচ্ছে। হিন্দির প্রতিপক্ষ যতগুলি আছে, তার মধ্যে বাংলা একটি। কিন্তু বাংলা ভাষাগোষ্ঠীর বেশির ভাগ পাকিস্তানে। সংখ্যাল্প অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাকে হিন্দির সঙ্গে রজ্জুবদ্ধ করা হচ্ছে। রাষ্ট্রভাষা ধীরে-সুস্থে চিবিয়ে চিবিয়ে যাতে জীর্ণ করে ফেলতে পারে, তারই যেন এক কৌশল।

বাংলা নামটাও থাকছে না। পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সংযুক্ত রাজ্য—সংক্ষেপে সংযুক্তরাজ্য পরে পূর্বরাজ্য বা অমনি একটা কিছু। আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্তপ্রদেশ থেকে ক্রমশ যেমন উত্তর-প্রদেশে দাঁড়িয়েছে। আগ্রা এবং অযোধ্যা নাম দুটো তবু রয়ে গেছে

ভারতভূমির উপর—ছুটো নামজাদা শহর। হায় বাংলাদেশ, তোমার নামে কি থাকবে—বঙ্গোপসাগর? কিন্তু বাংলার ভাগ্যে যাই ঘটুক, বিহার ছাড়তে যাবেন কেন? চেষ্টা চরিত্র করে তাঁরা পৃথক প্রদেশ পেয়েছেন। কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গ বাঙালি প্রাণপাত সংগ্রামে রদ করল, তারই গৌণ ফল বিহার প্রদেশের উৎপত্তি। ভাগ্যবান তাঁরা—অবিচারে আর অত্যাচারে বাংলার মতন নাভিশ্বাস-অবস্থা তাঁদের নয়, তাঁরা কেন বিহার নামের বিলুপ্তি হতে দেবেন? পশ্চিমবঙ্গ নামে যে তিনটে টুকরো আছে, পারেন তো সোজাসুজি তাই বিহারের মধ্যেই ঢুকিয়ে নিন না। ঝামেলা চুকে-বুকে যাক।

ভাষার দিক ছাড়াও একীকরণে আরও নানান সুবিধের কথা তোলা হচ্ছে। একটা হল উদ্বাস্তু-সমস্যার নিরসন। উদ্বাস্তু অভাগারা বঙ্গ-ভাষাগোষ্ঠীর হলেও তাদের ছুর্দৈব সর্বভারতীয় নেতারাই এনেছেন। দায়টা অতএব সর্বভারতীয়। সে দায় যথাযথ তাঁরা পালন করছেন। কিন্তু এখন কি ব্যাপার বলুন তো? বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ফলে যা-কিছু লভ্য, সমস্ত সকলের পাওয়া হয়ে গেছে। ভারতের সবগুলো রাজ্য যে বোঝায় হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন, পাওনা-গণ্ডা মিটে যাবার পর কাঁধ থেকে বোঝা নামিয়ে এখন তাঁরা ছুটো রাজ্যের ঘাড়ে চাপাতে চান? নিরুপায় পশ্চিমবঙ্গ জ্ঞাতগোষ্ঠী ফেলতে পারবে না, হাবুডুবু খাবে, হয়তো বা ডুববে। কিন্তু অপর সকলকে বাদ দিয়ে একা বিহারের কী দায় পড়ল পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মিলে এই বোঝা টানবার? বিহারেও ঘন-বসতি। বেকার এত বেশি যে এই পশ্চিমবঙ্গেরই অলিতে-গলিতে অশেষ কষ্টছুঃখ সয়ে তাঁদের দিন গুজরান করতে হয়। সাবধান বিহার!

ছুশমনকে শাস্তি দেবার এক প্রাচীন বনেদি রীতি আছে। হাত কাটো, পা কাটো, কান ছিঁড়ে নাও, চোখ খুঁড়ে ফেল—সর্বশেষে

দাও বুকে হাতিয়ার বসিয়ে। বাংলার উপরও সেই হামলা চলেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে কেটে আসামে বিহারে দিয়ে দিয়েছে। অর্ধেকের বেশি ছুঁড়ে ফেলে দিল পৃথক এক রাষ্ট্রে—যার নাম পাকিস্তান। সর্বশেষ এই একীকরণ। আগের কাজগুলো বিদেশি ইংরেজ করেছে দজ্জাল বাঙালিকে সায়েস্তা করবার জন্য। শেষ মারটা মারতে যাচ্ছেন আমাদেরই দেশি সরকার—ইংরেজ তাড়িয়ে যাদের গদি বানানোর জন্য এই বাংলাদেশই ফুলের মতন ছেলে-মেয়ে বলিদান দিয়েছে।

ভাষা, সাহিত্য, সংহতি

এই জয়পুরে আর একবার এসেছিলাম। এঁদের সঙ্গে প্রগাঢ় সম্পর্ক। রাজস্থান আর বাংলাদেশ—মাঝখানে কত জনপদ নদী পাহাড় অরণ্য। তবু বড় কাছাকাছি আমরা। আমাদের রামায়ণ-মহাভারত আছে, আর তৃতীয় এক মহাগ্রন্থ পেয়েছি—রাজস্থান। এই গৌরবগাথা লিখলেন এক ইংরেজ—আর বাংলাদেশ মনে-প্রাণে তাই আত্মসাৎ করে ভারতময় ছড়িয়ে দিল। বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ সাহিত্য-নেতারা উপন্যাস কাব্য নাটক লিখে রাজপুত-মহিমা কুটিরে কুটিরে পৌঁছে দিলেন, আবালবৃদ্ধ বাঙালির এঁরা আত্মীয়জন। আমার ছেলেবেলা কেটেছে দুর্গম পাড়াগাঁয়ে—যাত্রার পালাগানে সেই অত দূর অবধি রাজপুত বীরেরা হাজির হতেন। বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কোন কাহিনী হলেই সিংহ উপাধিধারী কেউ না কেউ নির্ঘাৎ তার নায়ক। তাই মরুসন্তান প্রতাপ আর মরুলক্ষ্মী পদ্মিনী বাংলার ছায়াস্নিগ্ধ পল্লীরই যেন সর্বত্যাগী ছেলেমেয়ে—বাংলার মায়েদের চোখের জলে তাঁদের

নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে (জয়পুর, কার্তিক, ১৩৬০) সাহিত্য-সভাপতির ভাষণ থেকে।

বীরত্বের নিত্য অভিষেক। শুধু বীরত্ব নয়, মাধুরীও—বীর প্রতাপের পাশাপাশি ভক্তিমতী মীরাবাঈ। মীরার ভজন বাঙালির কণ্ঠে কণ্ঠে। সে গান শুধু অধ্যাত্ম-পথিকেরই ভোগ্য নয়, আমাদের ঘর-গৃহস্থালিও আনন্দে নিত্য রোমাঞ্চিত করে তোলে।

জয়পুরে এসেই অম্বর-মুখো ছুটলাম দেবী যশোরেশ্বরীকে দেখবার জন্য। আমার বাড়ি যশোর, দেবীর সঙ্গে তাই বিশেষ সম্পর্ক। উদ্বাস্তু আমরা উভয়েই। উনি বাস ছেড়েছেন সাড়ে-তিনশ বছরের বেশি, আর হালফিল আমাদেরও ছাড়তে হল ইংরেজ তাড়ানোর মাশুল হিসাবে। বিদেশ-বিভূঁয়ে দেশের মেয়েটি কেমন আছেন, খবরাখবর নিতে গেলাম।

তা আছেন চমৎকার। পাহাড়ের উপর অপরূপ মন্দির, সোনা আর মণিমাণিক্য দেবীর গায়ে ধরে না। ভোগের অতি উত্তম ব্যবস্থা। পুরুত-সেবাইত মশায়দের চেহারা দেখে হিংসা হয়। দেশব্যাপ্ত অভাব ও বিক্ষোভের তরঙ্গ ঐ উঁচু মন্দির স্পর্শ করতে পারে নি।

আর এক নতুন খবর জানলাম মন্দিরের লেখা থেকে। মহারাজ মানসিংহকে দেবী স্বপ্নাদেশ জানিয়েছিলেন, দক্ষিণ-বাংলার নদী-খালের অঞ্চল থেকে তাঁকে উদ্ধার করে আনবার জন্য। দুরদৃষ্টি কী রকম, তা হলে বুঝুন। আস্তানা একদা ছেয়ে যাবে সুন্দরবনের জঙ্গলে, লোনা নদীর তরঙ্গে প্রাঙ্গণ ধ্বসে ধ্বসে পড়বে, বাঘ হামলা দিয়ে বেড়াবে, দেশ ভাগ হয়ে জায়গাটা পাকিস্তান এলাকায় পড়বে —সেই অত কাল আগে ত্রিকালদর্শিনী আদ্যন্ত হিসাব কষে ফেলেছিলেন। ভাগ্যিস সরে এসেছেন আগেভাগে, নইলে বাস্তুহারা আর দশটি বিগ্রহের সঙ্গে পাইকারি হারে তাঁকেও ঠাঁই নিতে হত পশ্চিম-বাংলায় কোন এক গাছতলায়—সারাদিনে নিরম্বু হটো বেলপাতা ছোঁয়াবারও মানুষ মিলত না।

পূর্বাহ্নে যথাযথ ব্যবস্থা সেরে দেবী যশোরেশ্বরী ঝামেলা

এড়িয়েছেন, কিন্তু মারা পড়ি মূঢ় নগণ্য প্রাণী আমরা। এত সমস্ত কে জানত? ইংরেজ তাড়াতে পারলে সকল দুঃখের অবসান হবে, সর্বস্ব পণ করে তাই লড়াই করে গেছি। ফাঁসির দড়ি ফুলের মালার মতো গলায় নিয়েছে আমাদের সন্তানেরা, নির্বাসনে কারান্ধকারে প্রাণ দিয়েছে। উত্তরপুরুষ সগৌরবে তাদের জীবন-কথা পড়বে। তা পড়ুক—এবং অলৌকিক কীর্তিমান তারা, তাতে সন্দেহ নেই। তবু বলি, প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকি কিম্বা দেশবন্ধু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি মরে বেঁচেছেন। বেঁচে থাকলে ভারতের মানুষ হতেন না আর তাঁরা—হতেন বড় জোর উদ্বাস্তু।

রক্ত আর অশ্রুর সমুদ্র বিদারণ করে সূর্য দেখা দিল অবশেষে। স্বাধীনতা—আমাদের কত সাধ আর স্বপ্নের স্বাধীনতা! হাসতে গিয়ে কিন্তু হাঁ হয়ে যাই দেশ-বিভাগের গতিক দেখে। বাংলাদেশ দু-টুকরো—বড় ভাগটা ঐ পাল্লায়। নিরীহ গৃহস্থ-মানুষ হঠাৎ দেখে, দয়া ও দরদ-ভরা চিরকালের প্রতিবেশীদের আর চেনা যায় না, বাসভূমি রাতারাতি ভয়াল অরণ্য—হিংস্র জীবজন্তু চতুর্দিকে। সাতপুরুষের ভিটেমাটি চোখের জলে ভিজিয়ে পোঁটলাপুঁটলি ও পুত্র-কলত্র সহ ঘরের মানুষ বেরোল নির্বান্ধব পথে। তাঁতের মাকু—ওদিকের তাড়া খেয়ে এদিকে ছোটে, এদিকের তাড়া খেয়ে ওদিকে। সচ্ছল স্বচ্ছন্দ কত পরিবার বিনা অপরাধে উৎসন্ন হয়ে গেল! মানুষের ইতিহাসে এক অনপনেয় কলঙ্ক।

দুর্গতি যত বড় হোক, তা-ও এক সময়ে গা-সহা হয়ে যায়, দুঃখ ঝিমিয়ে আসে। একটু ঠাণ্ডা মাথায় তখন ঠাহর করে দেখি—সর্বনাশ, আমাদের মুখের বুলি নিয়েও টানাটানি চলছে। র‍্যাডক্লিফের খড়্গ দু-টুকরো করেছে বাংলাদেশের মাটি, কিন্তু বাঙালি-মানুষকে পারে নি। ঐতিহ্য ও জীবনরীতি দুই বাংলারই এক। ভাষা-সাহিত্যের অমোঘ ঐক্যসূত্রে তারা আবদ্ধ। স্বাধীনতার পরে আঘাত পড়তে যাচ্ছে তারই উপরে।

সর্বনাশা ভাঙনের মুখে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কঠিন এক বাঁধ। রাষ্ট্রিক অর্থনীতিক সামাজিক—সর্বপ্রকার যোগাযোগ একে একে কেটে দেওয়া হল, শুধু ভাষা-সাহিত্যের বন্ধন ধরে আছে উভয়-বাংলাকে। একটা মজার গল্প বলি। গত বছর এমনি দিনে আমি চীনে। এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সাঁইত্রিশটা দেশের মানুষ জমায়েত হয়েছিলাম। বিশ্বজন-হিতায় বিস্তর বক্তৃতা হল। পাকিস্তানিরাও ছিলেন। আমি বাংলায় বললাম, আর বাংলায় বললেন পূর্ববঙ্গের মজিবর রহমান। টেগোর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এই ভাষায় লিখেছেন, ঘোষণা করলাম বুক চিতিয়ে। এক বিদেশি শুধাল, তোমার ভাষা আর পাকিস্তানের উনি যে ভাষায় বললেন, দুটো কি অবিকল এক? এক রকম হরফ? দুটো আলাদা দেশে একই ভাষা চলে? রসিকতা করে জবাব দিই, বোঝ তা হলে! বাংলা আন্তর্জাতিক ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঠাট্টার কথা বাদ দিয়ে, ভাষা যে উভয় দেশকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে রেখেছে—এই পরম সত্য বিদেশির চোখেও ধরা পড়েছিল। কিন্তু এটা কতদিন টিকবে, উভয় তরফের মনে মনে ছিল সেই সন্দেহ। পূর্ববঙ্গের শঙ্কা হয়েছিল, উর্দু ভাষা এবং তৎসহ পশ্চিম-পাকিস্তানের জীবনরীতি ঘাড়ে চেপে সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ঘটাবে। শতেক বছরের চেষ্টাতেও বাঙালি মুসলমান উর্দু রপ্ত করতে পারেন নি, সেটা পরভাষাই রয়ে গেছে। সে ভাষায় তাঁদের আত্মস্ফুরণ ও আত্মপ্রসার অসম্ভব। বিগত শতকে ইংরেজির মাধ্যমে কত জনে এই প্রকার চেষ্টা করেছিলেন, ইংরেজিতে স্বপ্ন পর্যন্ত দেখতেন তাঁরা। তবু কিছু হল না। ফল পেলেন তাঁরা শেষ অবধি স্বভাষার আশ্রয় নিয়ে। পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবীদের এক ঘরোয়া সভায় আমিও হাজির ছিলাম। ওঁরা বললেন, ও-পারের বাঙালির সঙ্গে আলাদা হচ্ছি সেটাও তেমন বিচার্য নয়, আমরা ভাবছি

নিজেদের কথা। বাংলা ছাড়লে নিখিল-পাকিস্তানে চিরদিনের জন্য আমাদের পিছন-বেঞ্চিতে ঠাঁই হবে।

এরই ফলে ভাষা-আন্দোলন। মাতৃভূমির জন্য প্রাণ দিয়েছেন দেশে দেশে অনেক জন—সর্বকালের নমস্য তাঁরা। কিন্তু মাতৃ-ভাষার জন্য বন্দুকের সামনে বুক পেতে দেওয়া ঢাকা শহরে ঐ প্রথম দেখা গেল। হাসপাতালে নিয়ে এসেছে বার-চোদ্দ বছরের আহত বাঙালি মুসলমান ছেলে—কথা বেরুচ্ছে না মুখ দিয়ে, ফিসফিসিয়ে নিশ্বাস নেবার মতো করে বলছে—বাংলা চাই, বাংলা চাই…। বলতে বলতে চিরকালের মতো নিঃশব্দ হল অপারেশন-টেবিলের উপর। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে ওদের কাহিনী শুনে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিগঠনে মুসলিম সম্রাট্ ও মুসলিম লেখকদের দান অসামান্য। এ সমস্ত মেনে নিয়েও কারো কারো দেমাক ছিল, সেকালে যা-ই হোক, বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ প্রমুখ দিক্‌পালদের দিয়েছি আমরা—বাংলা-সাহিত্যের প্রধান দাবিদার তবে হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। কিন্তু এটা কি হল? নজরুল, মুজতবা আলি, ওদুদ ইত্যাদি নতুন কালের বহু কীর্তি-মানকে ওঁরা দিয়েছেন—কিন্তু এ সবের উপরেও বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উপর দাবি ওঁরা রক্তের লিখনে ব্যক্ত করেছেন। এর চেয়ে বলিষ্ঠ নিঃসংশয় দাবি কোন্ দেশে কে প্রকাশ করেছে?

এ প্রান্তে বঙ্গভাষী আমাদের মনেও এমনিতরো অসোয়াস্তি। খোলাখুলি আলোচনা হওয়া ভাল, মন গুমরে থাকা কিছু নয়। আমাদের গর্ব আর সাধনার ধন বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের অন্তিম আসন্ন নাকি প্রবলপ্রতাপ হিন্দিভাষার দাপটে? কিছু-সংখ্যক অদূরদর্শী হিন্দি-প্রচারকের পায়তারা ভাঁজার দরুন আশঙ্কা আরও বাড়ছে। এমনই তো বঙ্গভাষী লোকের দুই-তৃতীয়াংশ পাকিস্তানে—ভারতের মধ্যে সংখ্যায় আমরা কম হয়ে গিয়েছি। সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সর্ববিধ প্রগতির ধারক-বাহক মধ্যবিত্ত সমাজ

দেশবিভাগ ও অর্থনৈতিক সঙ্কটে উৎসন্নপ্রায়। জীবিকা ও রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে সকলকে যদি হিন্দির অনুশীলন করতে হয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হয়ে যাবে অপ্রয়োজনের সামগ্রী। সাহিত্যের অবাধ ধারাবহতা ও প্রাণাবেগ ক্রমশ ক্ষীয়মাণ হয়ে হয়তো একদিন মরুভূমির নদীর মতো বিশুষ্ক হবে। ভবিষ্যতের ভাষাতাত্ত্বিক পুরানো পুঁথিশালার কীটদষ্ট বই খুঁজে খুঁজে বাংলাভাষার লুপ্তাবশেষ নিদর্শন বের করবেন। হাসবেন না—ইতিহাসে ভাষা-বিলুপ্তির এমন একাধিক নজির আছে।

যেমন ধরুন, আয়ারদের গেলিক ভাষা। পঁয়তাল্লিশ লক্ষের মধ্যে ইদানীং হাজার ষোল মাত্র ঘর-ব্যবহারে ঐ ভাষা বলে। আর ইংরেজি এবং গেলিক উভয় ভাষা বলে থাকে লাখ ছয়েক। অথচ সমৃদ্ধ সাহিত্য আছে ঐ প্রাচীন ভাষার। এ হেন ভাষাকে সমাধিস্থ করবার সুনিপুণ ব্যবস্থা ইংরেজের। শিশুর পাঠশালা থেকেই নিখুঁত পদ্ধতিতে ওরা মারণ-ক্রিয়া শুরু করে দিয়েছিল। ইংরেজ-গুরু এসে ইংরেজি শেখায়—বাচ্চাদের গলায় কাঠের টুকরো ঝোলানো, ইস্কুলে সারাদিনের মধ্যে ভ্রমক্রমে যতগুলো গেলিক কথা উচ্চারণ করবে, সেই ক'টা দাগ পড়বে কাঠের উপর। ছুটির সময় যতগুলো দাগ, পিঠের উপর সেই ক'ঘা বেত। আরও আছে —সমাজের উপরতলার মানুষদের লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে ইংরেজি ভাষা ও শহবৎ শেখাচ্ছে। জনসাধারণ চাঁইদের অনুকরণ করে। ইংরেজি বলা ক্রমশ ফ্যাসান হল, গেলিক হয়ে দাঁড়াল অসভ্য মূর্খলোকের ভাষা। আয়ার্ল্যাণ্ডের ইংরেজ-কবলমুক্ত অংশ বিপুল চেষ্টা করছে গেলিককে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু মৃতদেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। এমনি আরও দৃষ্টান্ত আছে। ওয়েল্‌স্‌ ভাষা সে-দেশের শতকরা তেরো জনও বলে না। ভারতবর্ষেও আর্যেতর অনেক ভাষা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আর্য-ভাষার মধ্যে দু-দশটা শব্দের পরিচয়মাত্র নিক্ষেপ করে।

আয়ার্ল্যাণ্ডের ইংরেজ-পদ্ধতি আমাদের ভারতেও কিছু কিছু চলছে—শিশুর মুখ থেকে মায়ের বুলি কেড়ে নিয়ে তাদের হিন্দি শেখানো। এই অত্যুৎসাহীরা মহা-ভারত গঠনের—এমন কি হিন্দি-প্রসারণেরও বাধাস্বরূপ। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিশেষভাবে আজ সংহতির প্রয়োজন—সেখানে নতুন বিরোধ দানা বাঁধছে। ইংরেজের বহুবিধ কীর্তির মধ্যে প্রাদেশিক মনোভাব জাগিয়ে তোলা একটি। বিষের চারা সযত্নে রোপণ করে, যত দিন তারা বর্তমান ছিল, যথাবিধি জল-সেচন করে গেছে। লেখাপড়া শিখেও চাকরি পাচ্ছি নে, বিরোধটা এই নিয়ে শুরু। ভাষা নিয়ে লাঠালাঠি—সেটা একেবারে হাল আমলের। পিছন দিকে একটু দৃষ্টিক্ষেপ করুন—মনোরম ঐক্য-চিত্র। বাংলার কুমারীর চিরকালের বাসনা, সে সীতার মতো সতী হবে—রামের মতো পতি আর লক্ষ্মণের মতো দেবর পাবে। অযোধ্যাবাসী রাম-লক্ষ্মণ এসে হিন্দি (আব্ধী) জবানে সম্ভাষণ করবেন এবং বেকুব মেয়েটা ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকবে, এমন ভাবনা ভাবে নি কেউ কখনো। রামায়ণের সীতা বাংলারই এক কুলবধূ। যশোদাতুলাল শ্রীকৃষ্ণ বাংলার সকল মায়েরই তুলাল। অযোধ্যা-গোকুল-বৃন্দাবন বাংলারই গ্রামে গ্রামে। সাংস্কৃতিক এমনি একত্ব আমাদের। তীর্থভ্রমণ, রামায়ণ-মহাভারত ও নানাবিধ পুরাণ, যাত্রা-কীর্তন-কথকতা প্রভৃতি ভেদ-জ্ঞান নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। হিন্দির মহিমা নিয়ে বাংলা গর্ব বোধ করত। দাতু, কবির, সুরদাস, সন্ত্ তুলসী, কেশবদাস প্রভৃতির রসমাধুরী বঙ্গবাসী অঞ্জলি ভরে পান করে পরিতৃপ্ত হয়েছে। বাঙালির স্বাজাত্যবোধ তখন এই সমস্ত কবিদের নিয়েও। নাভাজিদাসের ভক্তমাল কৃষ্ণদাস ভগীরথের মতো বঙ্গভূমে বয়ে নিয়ে এলেন। মালিক মুহম্মদ জ্যায়সির পত্নমাবৎ বাংলার কুটিরে পদ্মাবতী হয়ে আসন বিছিয়ে বসলেন। ভারতচন্দ্র কবিতার জুড়ি হাঁকালেন বিশুদ্ধ বাংলা এবং হিন্দিতে—

সহজ সম্পর্ক মেনে নিয়ে পাশাপাশি তারা ছুটে চলল। ফোর্ট-উইলিয়াম আমলেও বাঙালির হাতে হিন্দির বাহার খুলেছে—যেমন তারিণীচাঁদ মিত্রের বেতাল পচীসীর সম্পাদনা। বিদ্যাসাগর মশায়ও বাংলায় বেতাল পঞ্চবিংশতি লিখে হিন্দির ঔজ্জ্বল্য বাড়ালেন।

পাশা উলটাল তারপরে। সমুদ্রের কাছাকাছি এবং কলিকাতা-অঞ্চলে ইউরোপীয় ঘাঁটি হওয়ায় বিশ্বের জীবন-প্রবাহ এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালির দ্রুত যোগাযোগ ঘটল। বাংলা-সাহিত্যে জোয়ারের কলধ্বনি। বঙ্কিমের সাহিত্য ভারতবর্ষ জয় করল—সেই অমৃতে মজে গেল ভারতীয় তাবৎ ভাষার মানুষ। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য মৈথিলীশরণ অতুল প্রীতি ও নিষ্ঠায় অনুবাদ করলেন হিন্দিতে। হিন্দি ও বাংলা যেন দুই বোন—ঘরোয়া লেনদেন উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে।

কিন্তু এবারে হিন্দি আসছে আলিঙ্গনের বাহু বাড়িয়ে নয়, কলে-কৌশলে রাষ্ট্রভাষার চাপরাশ বাগিয়ে আধিপত্য বিস্তার করতে। যে ইংরেজকে তাড়ানো হল, তাদেরই যেন স্বগোত্র। জবরদস্তি করে ঘাড়ে চাপতে চায়, সে রাজশক্তি হোক কিম্বা ভাষা হোক, লোকে একই চোখে দেখবে। যেন ভাষিক সাম্রাজ্য-বিস্তার। হিন্দির বর্হিজগতে যাঁদের ঘোরাফেরা, হুঙ্কারটা সেই তরফেরই বেশি—আসল হিন্দি-ভাষীদের খানিকটা বরঞ্চ উদাসীনই বলা যায়। বহু ভাষাকে হত্যা করে কিম্বা মুমূর্ষু ও মর্যাদাহীন করে একের বিজয়-যাত্রা—এ যাত্রা কখনো নির্বাধ হবে না। আপোষে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়াবে জবাই হবার প্রত্যাশায়, পাপ কলিযুগে এমন সাধু অহিংসক অতিশয় দুর্লভ। বিরোধ থেকে নতুন নতুন বিরোধ বাড়ে; দুর্বল আর দশজনকে নিয়ে দল জোটায়। এক পক্ষ হুমকি ছাড়ছেন এবং অপর পক্ষ আত্মরক্ষার জন্য উদ্ব্যস্ত ও মরীয়া হয়ে উঠেছেন—এটা আদৌ জাতীয় স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়।

আর এক চেষ্টা হচ্ছে—ভাষিক ঐক্যের প্রথম ধাপ হিসাবে সর্বত্র দেবনাগরি অক্ষরের প্রচলন। দিল্লির সংসদীয় হিন্দি পরিষদ ঐ ব্যাপারে অগ্রণী। এটা নতুন কিছু নয়—সারদাচরণ মিত্র মশায় বহুকাল আগে এক-লিপি-বিস্তার পরিষদ করেছিলেন —'দেবনাগর' নামে তাঁদের কাগজ ছিল। সংসদীয় হিন্দি পরিষদের কাগজেরও ঐ নাম। একাধিক প্রগতিশীল দেশে চলিত-লিপি ত্যাগ করে রোমান-অক্ষর পরিগৃহীত হয়েছে। যদি যথার্থ কল্যাণ আসে, পূর্বতন লিপি আঁকড়ে থাকবার কোন অর্থ নেই। কিন্তু বাংলাভাষার পক্ষে চলিত-লিপি ত্যাগ ও দেবনাগরি লিপি পরিগ্রহণ অসম্ভব। লিপি ছাড়লে পূর্ববঙ্গকেও ছাড়তে হবে একেবারে, দুই বঙ্গের বিচ্ছেদ পরিপূর্ণ হবে। বাঙালি আমরা কিছুতে তা হতে দিতে পারি নে। তা ছাড়া বাংলা অক্ষর দেবনাগরির চেয়ে সহজতরও বটে। ইংরেজি রোমান-লেটারে আর ব্লাক-লেটারে যে পার্থক্য, বাংলা আর দেবনাগরি অক্ষরেও তাই। ব্লাক-লেটারে পুরোপুরি কাজ চালানো সহজ নয়, শোভনও নয়।

আমি বাংলা দেশের সাহিত্যিক, বাংলা ভাষা নিয়েই তাই বিশেষভাবে আলোচনা করছি। কিন্তু স্বাধীন-ভারতে প্রতিটি রাজ্যের প্রত্যাশা, তার আত্মভাষা সুন্দর বলিষ্ঠ ও সর্বপ্রকাশক্ষম হবে। মাতৃভাষা মায়েরই মতন প্রিয়। তার উপরে—আক্রমণ না-ই যদি বলি—অবহেলা অন্তরে কঠিন আঘাত হানে। যেমন ব্যক্তি ও গোষ্ঠিজীবনে তেমনি ভাষার ব্যাপারেও নিরাপত্তা চাই রাষ্ট্রকর্তাদের কাছে। যে পিছিয়ে আছে—দোহাই প্রভুগণ, তাকে উপড়ে ফেলো না—সাহায্য করো সে যাতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। প্রতিটি রাজ্য নিজ-ভাষার উন্নতি-বিধানে তৎপর হয়ে উঠুক। ভারত-রাষ্ট্র বাংলা এবং অপর রাজ্য-ভাষাগুলির পরম মিত্র, সকলের মনে এই আস্থা আসুক। সংবিধানের তফসিল-ভুক্ত প্রতিটি ভাষাই রাষ্ট্রভাষা রূপে পরিগণিত হোক, স্বমর্যাদায়

তারা নিজ নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হোক। শিশুরা মাতৃভাষায় পাঠ নেবে এবং সর্বসাধারণ ঐ ভাষার মাধ্যমে কাজকর্ম চালাবে। কেবলমাত্র সর্বভারতীয় ব্যাপারে সংযোগের ভাষার ব্যবহার, অপর তাবৎ ক্ষেত্রে মাতৃভাষা। আজকের পৃথিবীতে ইংরেজি হল আন্তর্জাতিক বাতায়ন। ইংরেজি হঠিয়ে সেই বাতায়ন বন্ধ করা আত্মহত্যারই নামান্তর। এমন ভ্রান্ত জাতীয়তার মানে হয় না—তাছাড়া ইংরেজিও একরকম স্বভাষা হয়ে গেছে আমাদের। অতএব সংযোগের ভাষা ইংরেজি যেমন আছে, থাকুক। অনাবশ্যক কেন বোঝা বাড়াতে যাব? বহু রাষ্ট্রভাষা থাকা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে ভেদ বাড়বে না, প্রতিটি পর্ব রূপে গন্ধে প্রস্ফুট হয়ে দেশ-আত্মা একটি শতদল হয়ে ফুটবে।

এই রাজস্থানে, বিশেষত রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে, আছে ডিঙ্গল সাহিত্য। বয়সে প্রবীণ আর সমৃদ্ধিতেও বিপুল। মহা-মহীরূহ অবহেলায় নিষ্পত্র ও ফলপুষ্পবিহীন হয়ে উঠেছিল। সেই সাহিত্যের বিলুপ্ত মহিমা ফিরিয়ে আনবার জন্য চেষ্টা করছেন উদয়পুর বিদ্যাপীঠ, বিকানীর সাদুল রিসার্চ ইনস্টিট্যুট, কাশীর নাগরী প্রচারিণী-সভা, কলকাতায় রাজস্থান সাহিত্যপরিষদ প্রমুখ প্রতিষ্ঠানগুলি। সুদূর প্রাচী-প্রত্যন্তে বসেও আমরা তার নতুন পদধ্বনি শুনছি, উন্মুখ হয়ে আছি তার নব রূপ চাক্ষুষ করবার জন্য। ডিঙ্গল বলে নয়, সমস্ত প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যেই আসুক বিপুল জীবনাবেগ। সকলকে বাঁচিয়ে রেখে সকলের সন্তুষ্টি ও শক্তির সমবায়ে আমরা বড় হব। চীনে খোঁজখবর নিয়ে এলাম—সেখানেও এই পন্থা। অত বড় দেশে পিছিয়ে-পড়া জাতের সংখ্যা অন্তত পক্ষে ষাট—তাদের ভাষা বিভিন্ন। অনেক ভাষায়, সাহিত্য চুলোয় যাক,, বিধিমতো লিপি পর্যন্ত ছিল না। প্রত্যেকটি জাতিকে এখন ভাষিক ও অন্যান্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যাপক আয়োজন চলেছে।

হিন্দি ভাষার রূপও সর্বত্র এক নয়। (এমন কি ভাষাতাত্ত্বিকের

মতে বিহার ইত্যাদি স্থানের ভাষা হিন্দিই নয় আদপে।) প্রত্যেক জীবন্ত ভাষার এই ধর্ম। তবু এরই মধ্যে বহুর জীবন-সাধনায় এক সুষ্ঠু সাহিত্যিক-হিন্দি গড়ে উঠেছে, তাবৎ রসিকজনের যা শ্রদ্ধা ও গর্বের সামগ্রী। রাষ্ট্রভাষা নিয়ে কলহ ও অবিশ্বাস যেন সাহিত্যিক-হিন্দি সম্পর্কে কদাপি প্রযুক্ত না হয়।

ইংরেজিকে, রাষ্ট্রভাষা নয়—বলব সংযোজন-ভাষা। সেটা হল প্রয়োজনের ভাষা—সে ভাষা সাহিত্যরস-পুষ্ট কিনা আমাদের কাজের পক্ষে তা আদৌ বিচার্য নয়। সাহিত্যিক-হিন্দিকে এই পর্যায়ে নামালে তার গৌরব ও শুচিতা নষ্ট হবে। কোন সাহিত্যসেবী ও ভাষাপ্রেমীর এ প্রস্তাবে রাজি হওয়া উচিত নয়। সংযোজন-ভাষা অতএব সাহিত্যিক-হিন্দি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হতে বাধ্য। এই কর্মে ইংরেজি নিয়োগের একটা মনস্তাত্ত্বিক দিকও আছে। কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের পুরোপুরি ভাষা না হওয়ায় কারো মনে এ দম্ভ আসবে না যে আমার ভাষা সর্বভারতীয় হয়েছে। এ ক্ষোভও কারও থাকবে না যে আমার ভাষাকে নিচে নামিয়ে দিয়ে ভারতীয় আর একটি ভাষা মাথার উপর জেঁকে বসেছে।

কত মধুর ভাবনা মনে আসে! নিজ নিজ মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষার মহিমায় দেদীপ্যমান—নবোৎসাহে সর্বপ্রদেশবাসী আমরা ঐক্যবদ্ধ ও পরস্পর প্রীতিপর হয়ে উঠেছি। প্রীতি ও লোভের দৃষ্টিতে খুঁজব কার কোন ধনসম্পত্তি আছে ; সেই মাল পাচার করে আনব নিজ ভাষার চৌহদ্দির সীমানায়। এ কর্ম না বলে বিস্তর চলছে—আপনারা জানেন, আমিও জানি। কিন্তু সে ব্যাপার নয়—হাঁকডাক করে শ্রদ্ধা এবং গর্বের সঙ্গে অনুবাদের মাধ্যমে প্রতিবেশী ভাষার ঐশ্বর্য আমরা আহরণ করব। এমনি করে ভারতীয় প্রতিটি সাহিত্যের মান মোটামুটি এক রকম হয়ে দাঁড়াবে। সাগর-পারের সাহিত্য সম্পর্কে আমরা কত খবরাখবর রাখি, কিন্তু ঘরের পাশে

কে কি করলেন তার সম্বন্ধে আগ্রহ নেই তেমন। সাহিত্য হল সহিতত্ব—অর্থাৎ মিলন। পরস্পরের সাহিত্য না জানলে মনের মিলন আসে কি করে? রাষ্ট্রীয় সংবিধানগত ঐক্যটা কাজের গরজে—ওটা বাইরের বস্তু। বিভিন্ন ভাষিক অঞ্চলের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, অনুবাদের মারফতে লেনদেন এবং এমনি ভাবে অন্তরের ঐক্যসাধন একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

এর জন্য অগৌণে সংস্থা গড়ে তোলা হোক সর্বভারতের গুণী-জ্ঞানীদের নিয়ে। তার শাখা থাকবে প্রতিটি ভাষা-অঞ্চলে। এক ভাষার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি অপরাপর ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করবেন ঐ সংস্থা। রবীন্দ্রনাথের লেখা একলা বাঙালির নয়—সকল ভারতীয়ের এবং সর্বমানুষের। ঠিক এমনি কথাই রবীন্দ্রোত্তর আরো বহু লেখার সম্বন্ধে প্রযোজ্য। এই কাজে ব্যবসায়িক প্রকাশক-প্রতিষ্ঠানগুলির কতক সহায়তা পাওয়া যাবে। কিন্তু তাঁদের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা চলবে না, আপাত-লাভের দিকটাই দেখবেন শুধু তাঁরা। সংস্থার কাজ ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্মগুলির পরস্পর পরিচয়-স্থাপনা। গোড়ায় কিছু অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু সেটা নিশ্চিত উঠে আসবে। বাংলার কথাই বলি—চরম দুর্গতি ও বিপর্যয়ের মধ্যেও বাঙালি বই কিনে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের লালন করে আসছেন। লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিরোধ পুরাকালে যত ভয়াবহই হোক, কালক্রমে দুই বোন কিছু সন্ধি-স্থাপনা করে নিয়েছেন। মানুষের রস ক্ষুধা ও রুচি সম্পর্কে আমাদের আস্থা দিন দিন গভীরতর হচ্ছে। সংস্থার অনূদিত সাহিত্য রসিক-সাধারণ মূল্য দিয়েই গ্রহণ করবেন। চাই শুধু উদ্যোগিতা।

নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন এই দিক দিয়ে অনেক কাজ করছেন। বর্ষে বর্ষে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়। বঙ্গভাষী নন—এমন বহু বিদগ্ধজন সম্মেলনে যোগ

দেন, নানারূপ সহায়তা করেন। তার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ জাগে, পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা-সন্দেহের অনেকখানি নিরসন হয়। অধিবেশন যেখানে যেখানে বসে সেখানকার স্থানীয় সাহিত্য বাঙালি সাহিত্যরসিকদের কাছে পরিবেশিত হয়। এবারে যেমন উদ্যোক্তারা রাজস্থানী কবি-সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছেন। সেই আনন্দ-ভোজের প্রত্যাশায় আমরা লালায়িত হয়ে আছি। আসলে সাহিত্যরসিক সকলেই আমরা নেশাগ্রস্ত মানুষ—সর্বত্র সমধর্মী খুঁজে বেড়াই, তার ভাষা গোত্র বর্ণ যেমনই হোক না কেন। এমনি সব সম্মেলনের মাধ্যমে দূরবাসী স্বজনবর্গের সঙ্গে পরিচয় ঘটে; রসের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পরস্পর আত্মীয়তা উপলব্ধি করি। ভারতের প্রত্যেকটি ভাষার তরফ থেকে ভিন্ন ভাষা-রাজ্যে এমনি ধরনের সম্মেলনের ব্যবস্থা হোক। বিভিন্ন সাহিত্যের মিলন এইরূপে বহুব্যাপক হবে। যে সংস্থার কথা আগে বলেছি, তারও এই কাজ—সুষ্ঠুতর ও অধিক নিয়মানুগ ভাবে।

ভাষার পার্থক্য একটা বাধা বটে, কিন্তু সে বাধা অনতিক্রম্য নয়। ওটা বাইরের খোলস। সারবস্তু যদি বিশেষ রকমের লোভনীয় হয়, রসপিপাসুরা খোলস ভেঙে আস্বাদ গ্রহণ করবেনই। রবীন্দ্রনাথ তো বাংলায় লিখেছিলেন, তবু সম্ভব হল কি তাঁকে আটকে রাখা সঙ্কীর্ণ বঙ্গভাষা-গণ্ডির ভিতরে? দুনিয়ার মানুষ তাঁকে নিয়ে নিয়েছে। কী বিপুল সম্মান তিনি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে এসেছেন ভারতের এবং বিশেষ করে বাংলার মানুষের জন্য, দেশের চতুঃসীমার বাইরে পা বাড়ালেই সেটা মালুম হয়। উত্তরাধিকারী হিসাবে সেই গৌরব মাথায় তুলে নিই, অকৃতী হয়েও তাঁর পুণ্যে নন্দিত হয়ে উঠি।

বিজ্ঞান-দাক্ষিণ্যে 'দূর' কথাটা অভিধানে আর থাকছে না। অতি-ছোট আজকের পৃথিবী—তার এপিঠে-ওপিঠে গতায়াত

নিতান্তই এ-পাড়া-ওপাড়া ঘুরে বেড়ানোর শামিল। ভূমিগত নৈকট্যই শুধু নয়, মানুষও বড় কাছাকাছি। কারো আর বিচ্ছিন্ন একক হয়ে থাকবার জো নেই—এক অর্থনৈতিক সূত্রে সকলে সম্বন্ধ। গণ্ডির মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা মৃত্যুর নামান্তর।

ঋষি রবীন্দ্র এই বিশ্বজনীনতা অনুধাবন করে চতুর্দিকের দরজা খুলে দিলেন। বিশ্বভারতীর উদার আমন্ত্রণ পাঠিয়ে দিলেন তাবৎ বিশ্বে। উপলব্ধি হল—ক্ষুদ্র নই সামান্য নই, আমরা বিশ্বের মানুষ। সমগ্র মানবগোষ্ঠি এক হয়ে আসছে, ধরিত্রীর যাবতীয় জাতি যেন এক পরিবারস্থ। এই বিশাল পরিপ্রেক্ষিতে আজকের সাহিত্য-ভাবনা। বেদনা-আনন্দে বিমথিত সংগ্রামশীল মানুষ আর মালিন্যহীন আগামী কালের পৃথিবী। জীবন ভোর যার কামনা করে গেলাম—সৃষ্টির আদিকাল থেকে সুস্থমনা যত মানুষ এসেছেন, সকলেরই এই স্বপ্ন। আজকের বাংলা-সাহিত্যও তাই মধ্যবিত্তের একার নয়। সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমা শুধু বাংলা নয়, এমন কি হিমালয়-কন্যাকুমারী ব্যাপ্ত স্থানটুকুও নয়—অখিল ভুবন। এই বৃহত্তম জীবন-সাধনার ভূমিকা স্বরূপ সর্বাগ্রে ভারতভূমিতে অখণ্ড সাংস্কৃতিক মিলন-রচনার প্রয়াস।

সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যে কিছু হচ্ছে না, এমনি বলে কেউ কেউ আসর গরম করেন। সমালোচকের অতি-বড় আত্মসন্তুষ্টি, তিনি নিজে যেন আছেন আওতার বাইরে। অতএব দশের উপরে আসন নিয়ে নির্বিঘ্নে আপ্তবাক্য বর্ষণ করা যায়। অতীত সম্পর্কে মোহ থাকে মানুষের, আর বর্তমান সম্পর্কে অবহেলা। এই বর্তমান যখন অতীতে বিলীন হবে, তখন আবার এরই প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হবে তখনকার মানুষ। এমনি হয়ে আসছে—নিজেদের অতীত নিয়েই ভেবে দেখুন না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—সমকালের কাছে কে রেহাই পেয়েছেন ? আজকে বাহবা দিচ্ছি, কিন্তু তখনকার সমালোচকের লগুড়াঘাতে তাঁরা যে বাণপ্রস্থ নেন নি, সে কেবল

'সাহিত্যের কামড় কচ্ছপের কামড়' বলেই। পাঠকের রুচি তাঁরা অত্যন্ত উচ্চগ্রামে বেঁধে দিয়ে গেছেন—সহজে তাঁদের ভোলানো যায় না। বঙ্কিম-রবীন্দ্রের মানসসন্তান আজকের সাহিত্যিকের এই কারণে সামান্য হবার উপায় নেই। দশ কাজের মধ্যে অবসর মতো কিঞ্চিৎ সাহিত্য-সেবা করলাম তাতে প্রসন্ন হন না নিষ্ঠুর পাঠক-দেবতা। সাহিত্য এক বিষম সাধনা। এবং একাগ্র সাধন-ফলে সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার গতিও আজ অতিশয় সহজ এবং স্বচ্ছন্দ হয়েছে। মনের গূঢ়তম ভাবনা এবং জগতের কঠিনতম বিষয় অবলীলা-ক্রমে প্রকাশ করে যাই—পাঠকপক্ষে বুঝবার তিলমাত্র কষ্ট নেই। তাবৎ কষ্ট লেখকই স্বীকার করে নেন। উর্বর ভূমিতে আগাছা সর্বকালেই জন্মে, তাকে ফসল ভেবে নিরর্থক কেউ হা-হুতাশ করবেন না।

আধুনিক সাহিত্য নাকি সেকালের গভীরতা হারাচ্ছে। কালটাই যে আলাদা! তখনকার নরচিত্ত প্রায় নিস্তরঙ্গ দীঘি। গভীর তলদেশ অবধি দেখা যেত, তারার আলো ঝিকমিক করত সারারাত, গোধূলির অরুণরাগ বিভাসিত হত। চারিদিকে নিঃসীম শান্তি—নৈমিষারণ্যের তপঃক্ষেত্রের মতো। জীবনের অমৃতরসে অবগাহনের ধ্যান-নিমীলিত পরিবেশ। কিন্তু বিজ্ঞানের বেগবান প্রবাহে সে-কাল ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তপঃক্ষেত্র এখন মানুষের সংগ্রামক্ষেত্র। আবেগ ও অধীরতা সর্বত্র। স্থির-বিশ্বাস সংশয়ের রাহুগ্রস্ত। চিত্ত-সন্তোষ দুরাশার স্রোতে উৎক্ষিপ্ত। বাহির-সমুদ্রের ঝড়ে আমাদের সঙ্কীর্ণ গৃহাবেষ্টন শতধা হয়ে গেল—নব নব পথে জীবনের বহুবিচিত্র প্রয়াণ। সাহিত্য-সৃষ্টি তিলেকের জন্যও থেমে দাঁড়ায় নি এই জটিল ঘূর্ণাবর্তে—থামলেই তো মৃত্যু। পথ নির্ভুল কিনা বলা যায় না, কিন্তু সাহিত্যিকের সক্রিয় মন এগোচ্ছে কালের সঙ্গে। বর্তমানের প্রাণোচ্ছলতা দোলা দিয়েছে নবীন-সাহিত্যকে।

*　　　*　　　*　　　*

সাহিত্যের কাজ জীবনের প্রকাশ ও ব্যাখ্যা। মানুষের সুখ-দুঃখ সংগ্রাম-শান্তি ফুটিয়ে তুলি আমরা লেখায়—আর তারও চেয়ে বড় কাজ মানুষের আশা ও ঔজ্জ্বল্যময় ভবিষ্যতের ছবি লিখে জীবনের প্রতি ভালবাসার বিস্তার করি। সাহিত্য তাই একাধারে জীবনের ভাষ্যকার ও পথিকৃৎ। শিল্পী আমরা—ক্যামেরার ছবি তুলে বেড়াই না, ছবি আঁকি। সে ছবিতে আপনার চেহারা আছে বটে, কিন্তু শুধুমাত্র আপনার ছবিটুকুই নয় সেটা। যাদুকরের মতো আপনার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছি, স্বপ্নে ও বাস্তবে একাকার—আপনি ধরতে পারেন না। আপনাকে নিয়ে যা রচনা হল, সত্যি-সত্যি আপনি তা নন ; আপনার যেমনটি হওয়া উচিত ছিল, তারই ছবি। বর্তমান আমরা মানস-স্বপ্নে রঙিন করে তুলি, সকলের তাই এত ভাল লাগে। অবাস্তব ভবিষ্যৎ আর প্রত্যক্ষ বর্তমান বেমালুম মিলেমিশে রয়েছে সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে। পাঠক-চিত্ত পূর্ণ স্বরূপের উপলব্ধিতে অনুরণিত হয়, চেনা পরিজন ও ঘরের বন্ধন ছেড়ে অনন্তে পাখা বিস্তার করে। বিধাতার জীবজগতে অনেক অপূর্ণতা —সাহিত্য তার পরিপূর্ণ রূপ দিতে চায়। খোদার উপর খোদকারি করেন সাহিত্যিক। বিশ্বের ব্যক্তি বলুন বা সমাজ বলুন—সাহিত্য তার প্রতিচ্ছবি নয়, পরিপূরক। সাহিত্যই সভ্যতা।

এমনি করে আমরা মানুষের এগিয়ে যাবার রসদ জোগাচ্ছি। এই হল সাহিত্যের সুমহৎ সমাজকৃত্য। আপনি-আমি থাকব না, কিন্তু ভাবনার ধারাবহতা থাকবে। পূর্বসূরীরা পরস্পর চিন্তা-চেষ্টা করে গেছেন—সেই সমৃদ্ধিসম্ভার বহন করে আমরা এগিয়েছি। পিছনে আসছেন নতুন কালের স্রষ্টারা। তাঁদের পরে আরও আসবেন। তারও পরে। এমনি করে মানুষকে আমরা সর্বকালের ঈপ্সিত অমৃতলোকে নিয়ে তুলব।

তুমি আর আমি

তোমার কবিতা পড়িতেছি বসে, আর ভাবি মনে মনে—
তুমি যেন সুগোপনে
হাওয়ার মতন টিপি টিপি পায়ে আসিয়াছ মোর পাশ,
চোখ না চাহিয়া বেশ বুঝিতেছি মৃদুতম নিঃশ্বাস।
নয়নেতে যেন আঙুল বুলালে, সব হল সোনামাখা,
ঘর ছেড়ে মন গুঞ্জনি' নীল আকাশে মেলিল পাখা।
ছেঁড়া মাদুরেতে আসিয়া বসিলে ঘেঁষাঘেঁষি গা'য় গা'য়,
চারি পাশ দিয়ে মিনিট-ঘণ্টা পলকে উড়িয়া যায়।
সামনে কবিতা বই—
তুমি আর আমি গলাগলি হয়ে মন খুলে কথা কই।

*　　　*　　　*

চোখ তুলে দেখি, নিখিল ছুটেছে ফুল-চন্দন-হাতে।
মনে মনে হাসি। যাহারে খুঁজিস সে যে হেথা মোর সাথে।
আলপনা-আঁকা মাটির দেয়াল, দোরে ধান-মঞ্জরী,
মোরা দু'জনায় মৌন আলাপ ছোট্ট ঘরটি ভরি',
—নাই কোন কলরব।
ভারি মজা লাগে—বাহিরের ওরা ডাকিয়া মরুক সব!
এই যে বসেছি গোপনে দু'জনে ছেঁড়া মাদুরের কোণে,
তুমি যাইবে না যতই ডাকুক, ঠিক জানি মনে মনে,
—আজি নও আর কারো,
সারা মনে মোর তোমার কবিতা—পলাও, কেমনে পারো!

রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বিপুল আয়োজনে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে প্রকাশিত 'জয়ন্তী' উৎসর্গ'-এ কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী কবিতা 'দু-জনে বলাকা পড়ি' ঐ সময়ে 'বিচিত্রা' বিশেষ-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

দু'জনে 'বলাকা' পড়ি

শিয়রের কুলুঙ্গির মাঝে
সিঁদুরের কৌটো থাকে, চিরুণী, মাথার কাঁটা আরো কত ছাই-পাশ বাজে,
জমাখরচের খাতা, খোকার দপ্তরে-বাঁধা ধারাপাত আর বোধোদয়—
তারই নিচে দিনভোর সীমাহারা মহাকাশ চুপ করে ঘুমাইয়া রয়।
ছোট্ট মাটির ঘর। হাতের কাঁচের চুড়ি নানা কাজে বাজে চারিপাশ—
চুড়ির বাজনা শোনে কবিতা-পুঁথির পাতে ঘুমে লীন নীলিম আকাশ।

দিন ক্রমে ডুবে যায়, রাত্রি আসে। ছুটি পাই। শ্রান্ত দেহে এলাইয়া পড়ি।
জানলার বাহিরেতে অগণন তারকারা জেগে ওঠে রাত্রির প্রহরী।
ও-ঘরে শিকল পড়ে। শেষ হয়ে গেল তবে এতখনে ঘরনার কাজ—
হলুদে কালিতে মাখা ঘোমটা নামায়ে দিয়ে টিপি টিপি আসিল সলাজ।
একটু দাঁড়ায়ে থাকে। তারপর হেসে কয়—কই, তুমি পড়িতেছ কই?
কুলুঙ্গির কোণ হতে বাহির করিয়া আনি পাতা-ছেঁড়া কবিতার বই—
একখানা পুরানো 'বলাকা'।
প্রতিটি কবিতা তার পড়েছি যে কতবার, পাতে পাতে কালি-ঝুলি মাখা!
মাঝরাত গ্রামটিতে, খেয়াঘাটে লোক নেই, ঝাঁপ-আঁটা মুদির দোকান,
মোরা দু'টি চুপি চুপি তখন কবিতা পড়ি—জেগে ওঠে আকাশের গান।

দু'টি মাথা এক সাথে—দু'টি মন পাশাপাশি উড়ে যায় দুইখানি পাখা—
পাখনার দোলা লেগে আঁধিয়ারে ঢেউ জাগে, নিশি-রাতে উড়িল বলাকা।
সহসা কি চাঁদ ওঠে কাঁঠালের বনচুড়ে? বাঁধ ভেঙে আসে কি জোয়ার?
বান এসে লুটে পড়ে ঘরের বেড়ার 'পরে—কেঁপে ওঠে খিল-আঁটা দ্বার।
খুঁটিনাটি দরকারি শতেক ঘরের কাজ নতমুখে পড়ে থাকে নিচে—
গভীর নিশুতি রাতে গুন্ গুন্ গুন্ করে মেঘলোকে বলাকা উড়িছে।

আকুল নয়ন দিয়া ওর মুখে চেয়ে থাকি, ও চাহিয়া রহে মোর পানে—
ওই দুটি আঁখি তুলে আমার কুটির-কোণে সোনার স্বপন ডেকে আনে।
চেয়ে চেয়ে দেখি কতখন,
হলুদের দাগ-লাগা ঘোমটার আবছায়ে উছলিছে রঙিন জীবন।

রাতি ফুরাইয়া যায়। অলস ধানের বনে মাঠপারে চাঁদ পড়ে ঢলি'
আমার কোলের 'পরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে একগোছা শালুকের কলি।
ঊষা ওর মুখ 'পরে রাঙা ছায়া বুলাইয়া দিয়াছে কি অপরূপ রূপ—
রাজার ঝিয়ারি যেন কোলের পালঙে শুয়ে, দেখি তাই বসিয়া নিশ্চুপ।
শিথিল আবেশ ভরে ঠোঁটের পাপড়ি দু'টি ঈষৎ নড়িছে মাঝে মাঝে—
ডাকে বুঝি 'প্রিয়তম'! আমি কোন মহারাজা, ধ্বনিহীন ডাক মনে বাজে।

হঠাৎ তাকায়ে দেখি, 'বলাকা'র খোলা পাতা উড়ে গেল সারা ঘরময়—
ভোরের বাতাস লেগে নিভিল ঘরের বাতি, স্বপন পালাল্ পেয়ে ভয়।
কী জানি কি ভাবি বসে!···অশ্রু-সায়র-কূলে মানুষের চিরকাল বাস—
সুখের বাসর ভাঙে, এ কিছু নূতন নয়।—তবু পড়ে একটি নিঃশ্বাস।

মোদের জীবন লাগি' হে কবি, পুঁথির পাতে আলোক রাখিয়া দেছ ভরি'—
আঁধারে মরেছে যারা—চোখ ভরে জল আসে আজি যবে তাহাদের স্মরি।
আমার যে বেচা-কেনা তাহা শুধু দিনমানে, রাত হলে বসি রাজপাটে,
সত্তর বছর আগে যাহারা বাঁচিয়া ছিল, রাতদিন পড়ে র'ত হাটে।

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজগৎ

মানুষের যাবতীয় ইতিহাস ও প্রগতি উনিশ শতকে প্রধানত স্বাজাত্য-বোধকে আশ্রয় করে আবর্তিত হয়েছে। লোকের কাছে জাতীয়তা তখন মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড় সত্য। কিন্তু এই বিশ শতকে বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্যে গোটা পৃথিবী আমাদের নখদর্পণে। জীবন এখন বহুব্যাপ্ত, বিশ্বজোড়া আমাদের পরিজন। সকল দেশ সকল জাতি এবং সকল মানুষের সঙ্গে আমাদের অর্থনীতিক রাজনীতিক সামাজিক ও সংস্কৃতিগত সম্পর্ক। একক বিচ্ছিন্ন স্বাজাত্য মৃত্যুরই নামান্তর এখন।

ভারতীয় চিন্তায় এই বিশ্ববোধ চিরকাল ধরে বর্তমান। মানবিক সকল সাধনার মধ্যে উপনিষদ্ একে প্রধানতম বলে আখ্যাত করেছেন। ভারত নরশ্রেষ্ঠ বলে বরণ করেছে ঋষিদের। ঋষিত্বের প্রধান লক্ষণ ঃ

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
মুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

তারা পরমাত্মাকে সর্বত্র হতে প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন, সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সকলের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। বিশ্বমানবের সঙ্গে যোগ উপলব্ধি করা এবং শত্রু হোক মিত্র হোক উচ্চ হোক নীচ হোক সকলকে আপন করে নেওয়ার মধ্যেই, উপনিষদের মতে, মনুষ্যত্বের সার্থকতা। প্রতিদিনের ধ্যানমন্ত্র গায়ত্রীর মধ্যে এই সর্বানুভূতিরই চর্চা—ভূলোকের সঙ্গে নক্ষত্রলোক বাইরের সঙ্গে অন্তর ঈশ্বরের সঙ্গে সর্বভূত একত্র মিলিয়ে সন্দর্শন। বুদ্ধদেব এই বোধেরই পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য পদ্ধতি দান করেছেন—যাতে মানুষের মন অহিংসা থেকে দয়ায় দয়া থেকে মৈত্রীতে সর্বত্র প্রসার লাভ করে। বৌদ্ধমতে মৈত্রী কেবল একটি হৃদয়ের ভাব নয়—

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব(বম্বে, জানুয়ারি ১৯৬১)-এর ভাষণ থেকে।

একটি বিশ্ব-সত্য। যেমন সত্য এই আকাশের আলোক। সম্রাট অশোক বিশ্ববোধে প্রবুদ্ধ হয়েই বললেন, সবে মুনিশ পজা মম। পজা(প্রজা)-র অর্থ সন্তান। সকল মানুষই তাঁর সন্তান। ভুবনব্যাপ্ত সেই সন্তানদের মধ্যে রাজর্ষি অশোক শ্রেষ্ঠ-গুণীজ্ঞানীদের শান্তি প্রেম ও আনন্দের দৌত্যে পাঠালেন। পরবর্তীকালে বাদশাহ আকবর এলাহি ধর্ম-বিস্তারে যত্নবান হলেন, তারও মূলসত্য এই—স্যুলহ্-এ-কুল্ল্, প্রেম সকলের জন্য।

অনেক বৃহৎ সত্যের মতো এই বিশ্বচেতনাও সাধারণের কাছে নিষ্প্রাণ ও পুঁথিগত অবস্থায় থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে পরিবারে জন্ম, সাধারণ থেকে তাঁরা ভিন্ন। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন-প্রেরণা উপনিষদের মহাবাণী। পিতামহ দ্বারকানাথ কালাপানি পার হয়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরিক্রমণ করে বিশ্বমানসের প্রত্যক্ষ স্বাদ গ্রহণ করলেন। দ্বারকানাথের পূর্বে বিশিষ্ট বাঙালি হিন্দু একজন মাত্র সাগর পেরিয়ে ইয়োরোপ গিয়েছিলেন—তিনি রামমোহন রায়। রামমোহনকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের আদর্শপুরুষ (Hero of the life) বলে মান্য করতেন। বলেছেন, "তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে রুদ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্বকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন, আমরা সমস্ত পৃথিবীর, আমাদেরই জন্য বুদ্ধ খ্রীস্ট মহম্মদ জীবন-গ্রহণ ও জীবন-দান করিয়াছেন।"

দেবেন্দ্রনাথ শিশু-রবীন্দ্রনাথকে কোনো বিধিবদ্ধ শিক্ষার নিগড়ে বাঁধতে চান নি। পিতার সম্বন্ধে কবি বলছেন, "তাঁহার উপদেশ হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই, কিন্তু কোনো নিয়মের শাসনে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে আমাদের কর্মকে বদ্ধ করেন নাই।" সেই

তখনই বাইরের আকর্ষণ শিশুমনে চাঞ্চল্য আনত। শৈশবের কথায় কবি বলছেন, "বিশ্বজগৎ যেন বারবার করে আহ্বান করে বলেছে, তুমি আমার আপনার।...তখনও এই বহির্বিশ্বের উপলব্ধি আমার মনের ভিতরে অস্পষ্টভাবে ঘনিয়ে উঠেছে। ছোটো ঘরের ভিতরকার মানুষটিকে বাইরের ডাক গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল।"

মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিলাত গেলেন। পাশ করে ব্যারিস্টার হয়ে আসবেন। কবি বলছেন, "আমি (লণ্ডন) য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে পেয়েছিলুম তিনমাস মাত্র। কিন্তু আমাদের বিদেশের শিক্ষা প্রায় সমস্তটাই মানুষের ছোঁওয়া লেগে। আমাদের কারিগর সুযোগ পেলেই তাঁর রচনায় মিশিয়ে দেন নতুন নতুন মালমশলা। তিনমাসে ইংরেজের হৃদয়ের কাছাকাছি থেকে সেই মিশেলটি ঘটেছিল। আমার উপর ভার পড়েছিল, রোজ সন্ধ্যেবেলায় রাত এগারোটা পর্যন্ত পালা করে কাব্য নাটক ইতিহাস পড়ে শোনানো। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পড়া হয়ে গেছে। সেই পড়া ক্লাসের পড়া নয়। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের মিলন। বিলেত গেলেম, ব্যারিস্টার হইনি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মতো ধাক্কা পাইনি, নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত মেলানো—আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।"

পুস্তকাকারে প্রকাশিত কবির সর্বপ্রথম রচনা 'কবি-কাহিনী'। ১৮৭৮ অব্দে ছাপা হয়। তখন তিনি ষোল বছরের বালক। পরমাশ্চর্য ব্যাপার, সেই কাব্যের ছত্রে ছত্রে সর্বমানুষের প্রতি দরদ এবং অত্যাচার-অপগত শান্তিময় সুখী ধরিত্রীর স্বপ্ন। কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করতে লোভ হয়।

হিমালয়কে সম্বোধন করে কবি বলছেন :

> যা দেখিছ যা দেখেছ, তাতে কি এখনো
> সর্বাঙ্গ তোমার গিরি, উঠেনি শিহরি ?

কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্য-জগতে
রক্তপাত অত্যাচার, পাপ-কোলাহল
দিতেছে মনের-মনে বিষ মিশাইয়া !

এ অশান্তি কবে দেব, হবে দূরীভূত !
অত্যাচার গুরুভারে হয়ে নিপীড়িত
সমস্ত পৃথিবী দেব করিছে ক্রন্দন,
সুখশান্তি সেথা হোতে লয়েছে বিদায় !
কবে দেব এ রজনী হবে অবসান ?
স্নান করি প্রভাতের শিশির-সলিলে
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী।
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি !
নাইক দরিদ্র-ধনী, অধিপতি, প্রজা,…
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস !
নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা,
নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার-ব্যাভার !
সকলেই আপনার আপনার লোয়ে
পরিশ্রম করিতেছে প্রফুল্ল অন্তরে।

রবীন্দ্রনাথের বিশাল কাব্য-সমুদ্র থেকে যদৃচ্ছা অঞ্জলি ভরে এমনি বিশ্ব-বোধের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আহরণ করা যায় ঃ

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগৎ আসি সেথা করেছে কোলাকুলি
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।

(১৮৮২ অব্দের লেখা 'প্রভাত উৎসব')

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানব-হৃদয়ে মিশিতে,
নিখিলের সাথে মহা-রাজপথে
চলিতে দিবস-নিশিতে।
(১৮৯২ অব্দের লেখা 'বিশ্বনৃত্য')

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।

* * *

বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে
প্রতি কণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ
শতকোটি কর হানিছে।
(১৯০০ অব্দের লেখা 'উৎসর্গ')

জগতে আনন্দ যজ্ঞে
আমার নিমন্ত্রণ
ধন্য হল ধন্য হল
আমার জীবন। (১৯১০ অব্দের লেখা 'গীতাঞ্জলি')

পুঁথি বেড়ে যাচ্ছে। লোভ সামলে নিতে হল অতএব।
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, সেই সঙ্গে জাতীয়তার কবি—

দাঁড়ায়ে বিশাল ধরণীর তলে
ঘুচে গেল ভয়-লাজ
বুঝিতে পারিনু এ জগৎ মাঝে
আমারও রয়েছে কাজ।
স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রভাতে
কহিলাম জোড়করে—
এই লহ, মাতা, এ চিরজীবন
সঁপিনু তোমারই তরে।
(১৮৮৮ অব্দে লেখা 'পরিত্যক্ত')

তাঁর আন্তর্জাতিকতা স্বাজাত্যকে বাদ দিয়ে নয়। জাতীয়তার ক্রমপরিণতিতে কবি আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছলেন—কারো যদি এমন ধারণা থাকে, তিনি ভ্রান্ত। এই দুয়ের মধ্যে বিরোধ নেই। বরঞ্চ জাতীয়তা বিহনে আন্তর্জাতিকতা বস্তুনিরপেক্ষ ভাববিলাস মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত রবীন্দ্রকাব্যে এ দুটির বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছে। ঘুড়ি যেমন আকাশে ওড়ে, সুতার লাটাই মাটিতে।

বঙ্গভঙ্গে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতায় অথবা হিজলি-জেলের হত্যাকাণ্ডে কবিকণ্ঠ তিরস্কারে গর্জে উঠেছে। প্রতিকারের উপায় খুঁজেছেন তিনি, ক্ষেত্রবিশেষে কর্মোদ্যোগে নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। স্বদেশের বেদনায় যেমন তিনি ব্যাকুল, বহির্বিশ্বের দুর্দৈবও বারম্বার তেমনি তাকে বিক্ষুব্ধ করেছে। ক্ষোভ শুধুমাত্র অত্যাচারিতের জন্য নয়—অত্যাচারীর আত্মচরিত্র যে কলুষপ্রাপ্ত হল, এই দুঃখ বোধকরি তাঁকে অধিকতর পীড়িত করে। 'সভ্যতার সংকট' কবি-জীবনের শেষ অভিভাষণ—আলোচনাটি সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেছে। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপ থেকে পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার মহিমময় স্মৃতিধারণ করে এসেছিলেন, দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের বীভৎসতায় সেই স্মৃতি চুরমার হল—অশীতিবর্ষ আশাহত কবির আর্তনাদ এই 'সভ্যতার সংকট'। "জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।...মানব-পীড়নের মহামারী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবআত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।" দূর-অতীতের একটা কলঙ্ক-ঘটনার উল্লেখ করেছেন এই প্রসঙ্গে: "চৈনিকের মতন এত বড়ো প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থ-সাধনের জন্য বলপূর্বক অহিফেন বিষ-জর্জরিত করে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ

আত্মসাৎ করলে।” চীনের আফিম-যুদ্ধের ব্যাপার। জীবনের সর্বশেষ ভাষণে যার উল্লেখ, একেবারে প্রথম জীবনে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে সেই অন্যায়ের প্রখর প্রতিবাদ করেছিলেন প্রবন্ধ লিখে। সেই প্রবন্ধের নাম ‘চীনে মরণের ব্যবসায়’।

বিশ্বের মানুষের সঙ্গে কবি যেন এক-পরিবারস্থ। পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে মনুষ্যত্বের উপর যখনই আঘাত পড়েছে, কবির লেখনী খরধার অসি হয়ে ঝলক দিয়েছে। আমেরিকায় নিগ্রো স্ত্রী-পুরুষের উপর চাবুক মারা, জার-শাসিত রাশিয়ায় ইহুদি-হত্যা, কংগোয় বেলজিয়ানদের অত্যাচার, স্পেনে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফ্যাসি-আক্রমণ, হিটলারের চেকোশ্লোভাকিয়া-অধিকার—কোন অন্যায় কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি।

১৯১৩ অব্দে নোবল-প্রাইজ পেলেন। ভুবনের জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা-বৃদ্ধির অধিকতর সুযোগ হল এই সম্মান-লাভে। প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কঠোর প্রতিবাদপত্র প্রকাশ করলেন—তখন তিনি একক নন, সর্বদেশের বুদ্ধিজীবীরা মিলিত হয়েছেন সেই ব্যাপারে। ১৯১৬ অব্দে কবি জাপান ও আমেরিকা-ভ্রমণে বেরুলেন—আলোচনার প্রধান বিষয় ‘জাতীয়তা’। পূর্ব ও পশ্চিমের জাতীয়তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেন তিনি। পশ্চিমের জাতীয়তার পরিণতি যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য-বিস্তারে ; আর প্রাচ্য জাতীয়তা চিরদিন শান্তি ও বিশ্বমৈত্রী প্রচার করে এসেছে।

শান্তিনিকেতনে অনেক বছর আগে প্রাচীন আশ্রমের আদর্শে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এবারে কবি সেখানে ‘সর্বমানবের যোগসাধনের সেতু’ রচনার সঙ্কল্প করেছেন। লজ এঞ্জেলস থেকে এই সময়ে লেখা একখানা চিঠি : “ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতির মহা-মিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোলবৃত্তান্তের অতীত করে তুলব, এই আমার মনে আছে—সর্বমানবের জয়ধ্বজা

ঐখানে রোপণ হবে।" প্রতিষ্ঠানের নামও স্থির করে ফেললেন—বিশ্বভারতী। বিশ্ব অর্থাৎ জগৎ, আর ভারতী হল জ্ঞান-সংস্কৃতি। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ভারতী—এ রকম অর্থ করলেও বেমানান হবে না।

প্রথম-মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ১৯২০-২১ অব্দে কবি আবার বেরিয়ে পড়লেন ইয়োরোপ ও আমেরিকায়। কণ্ঠে মানবমৈত্রীর বাণী—পূর্ব-পশ্চিমে কোন অনৈক্য থাকবে না, নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক জাগ্রত হবে জাতিপুঞ্জের মধ্যে। এমনি কথা আরও অনেকে বলেছেন; পৃথিবীর দেশে দেশে অনেক ভাবুক মহাপ্রাণ বিশাল আদর্শ নিয়ে বিস্তর স্বপ্ন দেখে গেছেন। নমস্য তাঁরা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু ভাবুক স্বপ্নদ্রষ্টা নন। মানুষের পরম সত্য কলমের লেখায় নানা বিচিত্ররূপে প্রকাশ করেই তিনি নিরস্ত হলেন না। স্বদেশে ফিরে এসে ১৯২১ অব্দের ডিসেম্বরে তিনি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করলেন। একটি সংহত সংস্কৃত বাক্যের মধ্যে বিশ্বভারতীয় লক্ষ্য ও চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে: 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'—তাবৎ পৃথিবী যেখানে একটি নীড় খুঁজে পেয়েছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের মুখের কথাই শোনা যাক:

"যুদ্ধ ও সন্ধির ভিতর দিয়ে যে নিদারুণ দুঃখ য়ুরোপকে আলোড়িত করে তুলেছে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, নেশন-রূপের মধ্যে মানুষ আপন সত্যকে আবৃত করে ফেলেছে। মানুষের আত্মা বলছে, 'অপাবৃণু'—আবরণ উদ্ঘাটিত করো। মনুষ্যত্বের প্রকাশ আচ্ছন্ন হয়েছে বলে স্বজাতির নামে পাপাচরণ সম্বন্ধে মানুষ একদিন এমন স্পষ্ট ঔদ্ধত্য করতে পেরেছে এবং মনে করতে পেরেছে যে তাতে তার কোন ক্ষতি হয় নি, লাভই হয়েছে। অবশেষে আজ নেশন যখন আপনার মুষল আপনি প্রসব করতে আরম্ভ করেছে, তখন য়ুরোপে নেশন আপনার মূর্তি দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

নতুন যুগের বাণী এই যে, আবরণ খোলো, হে মানব, আপন উদার রূপ প্রকাশ করো।…আমাদের এখানে নানা দেশ থেকে নানা জাতির অতিথি এসেছে।…আমরা এখানে কোন্ মন্ত্রের রূপ দেখব বলে নিয়ত প্রত্যাশা করব। সে মন্ত্র হচ্ছে এই যে—'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। দেশে দেশে আমরা মানুষকে তার বিশেষ স্বাজাতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে খণ্ডিত করে দেখেছি, যেখানে মানুষটিকে আপন বলে উপলব্ধি করতে পারিনে। পৃথিবীর মধ্যে আমাদের আশ্রম এমন একটি জায়গা হয়ে উঠুক, যেখানে ধর্ম ভাষা এবং জাতিগত সকল প্রকার পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা মানুষকে তার বাহ্যভেদমুক্ত মানুষ বলে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়াই নতুন যুগকে দেখতে পাওয়া।"

তাই হল। সর্ব ধর্ম জাতি ও ভাষার মিলনকেন্দ্র বিশ্বভারতী। মুসলমান ছাত্র-অধ্যাপক এলেন, খ্রীস্টান-বৌদ্ধ-জৈন এলেন—হিন্দু তো আছেনই। এলেন বাংলার বাইরের ভারতীয়েরা—মারাঠি, গুজরাটি, হিন্দুস্থানি, অসমিয়া, তামিল, অন্ধ্র, মালয়ালি। সমুদ্র-পারেও সাড়া পৌঁছে গেছে। এলেন ইংরেজ, ফরাসি, জর্মন, ইতালীয়, চেক, হাঙ্গেরীয়, মার্কিন, মিশরীয়, চীনা, জাপানি, সিংহলি, আফ্রিকার নিগ্রো, মার্কিন নিগ্রো, ইরানের পারসিক, ইসরায়েলের ইহুদি। শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে ভুবনের সর্বপ্রান্তের মনীষা এসে সমবেত হল।

বিশ্বভারতীর বাণী বহন করে পৃথিবীময় ছুটোছুটি শুরু হল কবির। চীনে গেলেন ১৯২৪ অব্দে। চীনে আর ভারতে হাজার হাজার বছরের পুরানো সম্পর্ক—সেই সুপ্রাচীন সৌহার্দ্য তিনি নতুন করে প্রতিষ্ঠা করে এলেন। সেই বছরই দক্ষিণ-আমেরিকার পেরুরাজ্যে—তাঁদের স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উৎসবে। ফেরবার পথে ইতালি। দু-বছর বাদে আবার ইয়োরোপ—পশ্চিম ও মধ্য-ইয়োরোপের সর্বত্র। গেলেন বলকান রাজ্যে, তুরস্কে ও মিশরে।

পরের বছর মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ এবং শ্যামরাজ্য পরিক্রমণ করে বৃহত্তর-ভারতের নব আবিষ্কার করে এলেন। পরের বছর কানাডা ও ইন্দোচীনে। তার পরের বছর ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করলেন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্মনি, ডেনমার্ক, রাশিয়া ও আমেরিকা। বিপ্লবোত্তর-রাশিয়া প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধবিস্ময়ে কবি লিখলেনঃ "রাশিয়ায় এসেছি। না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থেকে যেত।" তারপরেও কবি গিয়েছেন পারস্যে—১৯৩২ অব্দের এপ্রিলে।

বিশ্বব্যাপ্ত তীর্থ-পরিক্রমা! দেশে দেশে নর-দেবতার বহু বিচিত্র রূপ-সন্দর্শন। সহস্র বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনা। ভাষণে, গানে, আবৃত্তি ও অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ দিগ্বিজয় করলেন। ভারতের সাংস্কৃতিক বিজয়। ভারত অতি-দরিদ্র ও পরপদানত তখন, কিন্তু ভারতের কবি রাজরাজ্যেশ্বরের গৌরব আহরণ করে এলেন। না, তার অনেক বেশি। রাজসৈন্য রক্তবন্যা বইয়ে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে, বিজিতের অন্তরাত্মা বিমুখ হয়ে থাকে—রাজকীয় বিজয় অচিরস্থায়ী।

কতকাল কেটে গেছে তারপর। কবির দিগ্বিজয়ের ফল বহির্বিশ্বে আজও গিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায়। সাংস্কৃতিক দলবর্তী হয়ে কয়েকটা অঞ্চলে গিয়ে আমিও কিছু কিছু দেখেছি। শুধুমাত্র তাঁর দেশবাসী হওয়ার পুণ্যে রসিক বিদগ্ধমহলে অকস্মাৎ মান্যগণ্য হয়ে পড়তে হয়। ১৯৫২ অব্দে চীনে গিয়েছিলাম। পিকিনে একদিন সেণ্ট্রাল কলেজে কলেজ-অব-আর্টস দেখতে যাই। সেই সময়ের লেখা কয়েকটা ছত্র উদ্ধৃত করছি:

"দোতলায় উঠলাম। সামনেই শ্মশ্রুসমন্বিত আমাদের আপন মানুষটি—রবীন্দ্রনাথ। বিশাল হলঘরে অগণিত ছবির ভিড়ের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ আর সর্বপ্রধান। যত অন্যমনস্ক থাকন. নজর আপনার পড়বেই।

সুদূর চীনের জ্ঞানী-গুণীদের সমাজে গুরুদেব আজও জমিয়ে বসে আছেন, আমরা খবর রাখি নে। নতুন কালে প্রগতি শান্তি ও সৌহার্দ্যের তিনিই দূতিয়ালি করলেন। সে কতদিন আগের কথা। চিত্রপটের রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন হাস্যে তাঁর দেশের মানুষদের আহ্বান করলেন। শিল্পীর নাম চু-বি-আন (Chu-bei-haung)। কবিকে শিল্পী চোখে দেখেন নি—মানসস্বপ্ন তুলির টানে তুলে ধরেছেন।"*

১৯৫৪ অব্দে সোবিয়েত দেশে গিয়ে মস্কো শহরের য়্যুনিয়ন-অব-রাইটার্সে হাজির হয়েছি :

"একঘরে নিয়ে গেল। লম্বা টেবিল ঘিরে বসেছি—আমাদের তরফের এবং ঐ তরফের। অশীতিপর একজন রবীন্দ্রনাথের কথা তুললেন। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গেলেন, বিপ্লবের ধকল তখনো কাটে নি। নানান অভাব-অসুবিধা—খাবারদাবার পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথকে রাখা হয়েছে শহরতলির এক বাড়িতে। লোকজনের ঝামেলা কম, নিরিবিলি থাকেন।

বৃদ্ধ লেখক মশায় বলতে লাগলেন, বিপ্লবের আগেও তাঁর কবিতার তর্জমা হয়েছিল এদেশে। আমরা এঁর নাম জানতাম, লেখা পড়েছি। একদিনের কথা মনে পড়ে। পনের জন লেখক মোটমাট বসেছি একসঙ্গে। টেগোর প্রান্তদেশে। বারম্বার দেখছি তাঁকে, দেখে দেখে আশ মেটে না। মনে হল, প্রফেট। তাঁর মুখ-চোখ দাড়ি-পোশাক সব মিলিয়ে অপরূপ মনে হচ্ছিল। মৃদুস্বরে কথা বলছেন। সঙ্গীতের মতো সেই কণ্ঠ। দু-ঘণ্টা ধরে চলল। আমাদের ভয় হচ্ছে, ক্লান্ত হয়ে পড়বেন তিনি। কিছু না। মস্কো তখন খুব বড় একটা গ্রামের মতো। এত বড় বৃহৎ দেশের রাজধানী এই—তিনি কিন্তু হতাশ হন নি···

ভারি এক মজা হল সেই সময়। বৃদ্ধ বলতে বলতে হেসে উঠলেন : কেমন করে রটে গেছে, গির্জার এক পাদরিকে

* চীন দেখে এলাম, ১ম পর্ব, ১১৮ পৃষ্ঠা

লুকিয়ে রেখেছি আমরা ঐ বাড়িতে। টেগোরের দাড়ি ও লম্বা পোশাক দেখে ভেবেছে তিনি পাদরি। বিপ্লবের জের আছে তখনো, পাদরি-পুরুতের উপর লোকের রাগ। বড়লোকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পুরানো ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় ছিল তারা। জনতা একদিন হামলা দিয়ে পড়ল। আমরা বলি, মস্তবড় কবি, ভারত থেকে এসেছেন—মহামান্য অতিথি। তখন বলে, দেখতে দাও ভাল করে। টেগোর উপরের বারান্দায় এলেন। সকালবেলা রোদে চারিদিক ভরে গেছে, তার মধ্যে ঐ সুঠাম সৌম্য দীর্ঘদেহ এসে দাঁড়ালেন। মুগ্ধ জনতার জয়ধ্বনি উঠল। তখন আবার নতুন উপসর্গ—রোজ এসে ভিড় করে: টেগোরকে দেখব। কবি বারান্দায় বেরিয়ে আসেন, দেখে পরিতৃপ্ত হয়ে লোক ফিরে যায়।"*

১৯৫৭ অব্দে বার্লিনে গিয়ে শুনি কয়েক শ' মাইল দূরে কার্লমার্কসস্তাদ (আগের নাম চেমনিজ) শহরে খুব জাঁকিয়ে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। অভিনয় দেখবার জন্য ভারতীয় আমাদের নিমন্ত্রণ এল। অভিনয়ের পরে রাত দুপুরে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ এবং অভিনয়শিল্পীরা খাতির করে আমাদের হোটেলে চলে এসেছেন। "ডিরেক্টর কেসলার রবীন্দ্রনাথের কথা তুললেন। টেগোর এসেছিলেন, তখন যুবা আমি। তাঁর আশে-পাশে ঘুরতাম।

আর কোথা যাবে! সকলে ধরে বসল: বলুন তাঁর কথা।

আশ্চর্য কণ্ঠ, এমন মিষ্টস্বর কখনো শুনি নি। সৌম্য চেহারা, দুধের রঙের দাড়ি। অনেক করে বলা হল, কিন্তু টেগোর বক্তৃতা করলেন না। ডাকঘর অভিনয় করলেন।"**

(প্রাগের ঘটনা বইয়ের গোড়াতেই পড়েছেন।)

* সোবিয়েতের দেশে দেশে, ২৪৭ পৃষ্ঠা

** নতুন ইয়োরোপ: নতুন মানুষ, ২২৯ পৃষ্ঠা

সাহিত্য-কথা ও 'নিশিকুটুম্ব'

বাংলা সাহিত্যের অতুলন সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ ও পূর্বসুরীরা ভাণ্ডার ভরে রেখে গেছেন, পাঠকের তবু অন্তহীন তৃষ্ণা। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখেরা রুচি উচ্চগ্রামে বেঁধে দিয়ে গেছেন, মামুলি জিনিসে বাঙালি পাঠকের তৃপ্তি নেই। সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে তাই অবিরাম নবদিগন্তের সন্ধান চলেছে। আমিও ব্যতিক্রম নই। এতকাল লেখনী চালাচ্ছি, পথ খোঁজার আজও বিরাম হল না। এই 'নিশিকুটুম্ব' উপন্যাসের ব্যাপারেই দেখুন না।

সবিস্তারে বলছি।

কিশোর বয়সে গল্প বলতে ভালবাসতাম। শিশুরা এসে ঘিরে ধরত।

কোন্ গল্প শুনতে চাও?

ফরমাস নানা রকমের। তবে সব চেয়ে প্রিয় ভূতের গল্প, বাঘের গল্প আর চোরের গল্প। মগ্ন হয়ে শুনত তারা, শুনতে শুনতে আহার-নিদ্রা ভুলে যেত।

বয়স বেড়ে গিয়ে জীবনের অপরাহ্ণ দেখা দিয়েছে। কিন্তু গল্প বলা আজও চলছে। এখন আর মুখে বলি না, লিখে বলি। সেকালের গল্প-প্রিয় শিশু-শ্রোতাদের ভুলতে পারি নে। এখন তাঁরা বয়স্ক—জ্ঞানী গুণী সংস্কৃতিবান। কিন্তু গল্পের পিপাসা নিঃসন্দেহ আজও অদম্য—গল্প আর মুখে শোনেন না, লেখায় পড়েন। তাঁদের তৃপ্তি দেওয়াই জীবন-সাধনা আমার। তাই নিয়ে অহরহ চিন্তা-ভাবনা।

সাহিত্য আকাদেমি আয়োজিত সাহিত্যিক-সমাবেশ (নয়াদিল্লি, মার্চ ১৯৬৭)-এর ভাষণ থেকে।

সেকালের সেই শিশু-বয়সের মতো ভূতের গল্প কি তাঁরা পছন্দ করবেন? না করার হেতু নেই। বয়স যতই হোক, গল্প শোনার বাবদে মানুষ তো শিশুই। অবশ্য বয়স্ক-শিশুর উপযোগী করে লিখতে হবে! বিদেহীদের নিয়ে ছোটগল্প কতকগুলো লিখলাম। তারপরে একটা-উপন্যাস—'আমার ফাঁসি হল'—নায়িকা প্রেতিনী। বিয়ের কয়েক ঘণ্টা আগে নিষ্ঠুরভাবে তাকে হত্যা করেছিল। তরুণী-সুলভ প্রেমতৃষ্ণায় ব্যাকুল সেই নায়িকা—কিন্তু দেহের অভাবে সাধবাসনা পূর্ণ হচ্ছে না। প্রেতিনী-নায়িকার এই ট্রাজেডি পাঠকচিত্তে দোলা দিয়েছিল বলে মনে করি। সাহিত্য-নায়ক রাজশেখর বসু পর্যন্ত সানন্দে মন্তব্য করেছিলেন: "নব রসের মধ্যে ভয়ানক আর বীভৎস-রস লেখকেরা পরিহার করে থাকেন। গল্পটির প্রধান অবলম্বন ভয়ানক-রস, তার সঙ্গে জল আর জঙ্গলের পরিবেশ আছে। সব সুদ্ধ মিশে গল্পটি মোহময় অদ্ভুত ও চমৎকার হয়েছে।"

শিশুরা শুনতে চাইত বাঘের গল্প। ভাল করে যদি বলতে পারি, বয়স্ক-শিশুরাই বা কেন সে জিনিস পছন্দ করবেন না? গ্রাম আমার সুন্দরবন অঞ্চল থেকে দূরবর্তী নয় (এখন পাকিস্তানে চলে গেছে)। কাঠ কাটতে মধু ভাঙতে জীবিকার শতবিধ প্রয়োজনে লোকে বনে যায়—বাঘ-কুমির-সাপের কবলে পড়ে তার মধ্যে কত জনে আর ফেরে না। জনালয় থেকে বিচ্ছিন্ন,বনবিবি ও বাঘের সওয়ার গাজি-কালুর রাজ্য রহস্যময় সুন্দরবন ছোটবেলা থেকে আমায় আকর্ষণ করত। সুন্দরবনের বেশির ভাগ এখন পাকিস্তানে। দেশ-বিভাগের আগে সমগ্র সুন্দরবন আমি ঘুরেছি। পরে ভারতীয় অংশের সুন্দরবনেও গেছি কয়েকবার। ঠিক বাঘের গল্প নয়—কিন্তু রয়্যাল-বেঙ্গল টাইগারের আস্তানা সুন্দরবন নিয়ে দুটো উপন্যাস ('জলজঙ্গল', 'বন কেটে বসত') ও কতকগুলো গল্প লিখেছি আমি। কোন কোন অংশ একেবারে বনের ভিতরে খালের উপর

নৌকোয় বসে লেখা। এসব লেখাও পাঠকেরা সমাদরে গ্রহণ করেছেন। 'জলজঙ্গল' The Forest Goddess নামে অনূদিত হয়ে ভারতের বাইরেও প্রচার লাভ করেছে।

তবে চোরের গল্পই বা কেন দেবো না পাঠকদের হাতে? সমাজের আদিম পাপ দুইটি—চৌর্য আর গণিকাবৃত্তি। গণিকা নিয়ে পৃথিবীর নানা সাহিত্যে কালজয়ী সৃষ্টি রয়েছে, কিন্তু চৌরকর্ম নিয়ে কোন বৃহৎ সৃষ্টি আমার নজরে পড়েনি। কেন এই অবহেলা, বলতে পারি নে। উপন্যাস লিখতে বসে কয়েকটি বৃদ্ধ চোরের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাঁদের অতীত কথা শুনলাম। শুনে রোমাঞ্চ লাগে, ঘৃণ্য চৌরকর্মের মধ্যেও আশ্চর্য মানবিকতা মাঝে মাঝে তাঁদের জীবনে ঝলক দিয়ে গেছে। রিটায়ার্ড পুলিশ-দারোগা ও জনসাধারণের কাছেও বিস্তর চৌর-কাহিনী শুনেছি। এতকালের অনাবিষ্কৃত এক আশ্চর্য জগৎ—'নিশিকুটুম্ব' বইয়ে সেই বিচিত্র জগতের পরিচয়। দিনমানে আমাদের সৎমানুষদের সমাজ-সংসার ও কাজকর্ম, চোরের তখন বিশ্রাম। তাদের চলাচল নিশিরাত্রে, আমাদের ঘুমিয়ে যাবার পর। অলিখিত আইন আছে, সেগুলি তারা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। সুনিপুণ কর্মবিভাগ ও নিয়মশৃঙ্খলা। হেঁয়ালির মতন শোনাচ্ছে—কিন্তু চোরদের মতন সাধু অতিশয় বিরল। সাধুতা দলের মধ্যে—যার যেটুকু প্রাপ্য, তার মধ্যে তিলেক প্রবঞ্চনা নেই। সাধুরা কামিনী-কাঞ্চনে বীতরাগ, চোরের ক্ষেত্রে ঠিক অর্ধেক—কাঞ্চনলিপ্সু তারা, কিন্তু কামিনীতে অনীহা। অন্তর্যামী ঈশ্বরের কাছে কোন-কিছু গোপন থাকে না, চোরের সম্পর্কেও খানিকটা তাই। যে বাড়িতে চুরি হবে, খোঁজদার দীর্ঘ-কাল ধরে সেখানকার যাবতীয় খোঁজখবর নেয়। আপনি ঘুণাক্ষরে জানেন না, নিশীথে আপনার গোপন কথাবার্তা ও কাজকর্ম তারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেশুনে গেছে। লেখকের হাত নিশপিশ করে কিনা বলুন এমনি জিনিস নিয়ে লিখতে?

ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে পড়াশুনো করেছি এই বিষয় নিয়ে। যত ভিতরে ঢুকি, বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। ঋগ্বেদে পর্যন্ত চৌরকর্মের উল্লেখ আছে। 'চৌর্য' ও 'চাতুর্য' প্রায় সমার্থক ছিল আমাদের দেশে—সেজন্য চৌষট্টি কলার একতম চৌরবিদ্যা। মহাদেবের পুত্র দেব-সেনাপতি স্কন্ধ বা কার্তিকেয় এই চৌরশাস্ত্রের প্রবর্তক—চোরের অধিদেবতা তিনি। শাস্ত্রবিদ্ চোরেরা নিজেদের স্কন্ধপুত্র বলে গরব করে। মূল-শাস্ত্রকার ভগবান কনকশক্তি, ভাষ্যকার ভাস্কর নন্দী। বাংলার চৌরসমাজে স্কন্ধ ছাড়াও এক দেবী ঢুকে পড়েছেন—কালী। নানারকম চোরের পাঁচালি—তার মধ্যে কালীর কীর্তিকাহিনী পাওয়া যায়। নিজে তিনি সযত্নে চুরিবিদ্যা শেখাচ্ছেন, চোরকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ভূরি ভূরি চৌর-কাহিনী। দশকুমার-চরিতে দেখতে পাই, রাজপুত্র সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম—তবু তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ নয় চুরিবিদ্যার পাঠ নেননি বলে। অতএব চৌরবিদ্যার আচার্যের কাছে যেতে হল পাঠ গ্রহণ করতে। মৃচ্ছকটিক নাটকে শর্বিলক চতুর্বেদ-বিশারদ ব্রাহ্মণসন্তান, কিন্তু সুদক্ষ সিঁধেল-চোর। চুরির সবিস্তার বর্ণনা আছে—হাজার দুই বছর পরে আধুনিক চোরদের কাজকর্মও মোটামুটি সেই পদ্ধতিতে।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে বহুপ্রাচীন এক পুঁথি পেয়ে গেলাম —সন্মুখকল্প। অর্থাৎ ছয়মুখ-ওয়ালা কার্তিকেয় সম্পর্কিত বিধি-নিয়ম—সাদা কথায় চৌরবিজ্ঞান। পাঠ করতে চাই পুঁথিটা, কিন্তু কর্তৃপক্ষ নারাজ। পুঁথির এমন অবস্থা, নাড়াচাড়া করতে গেলেই গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাবে। সংস্কৃত কলেজের (এখন ভূতপূর্ব) প্রিন্সিপ্যাল সুপণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রী মশায় আমায় বড় সাহায্য করলেন—কলেজের জন্য তিনি ঐ পুঁথির মাইক্রোফিল্ম করিয়ে আনলেন। পরে প্রোজেক্টরের সাহায্যে আমার পাঠের ব্যবস্থা করে দিলেন। বিস্তর চমকদার বস্তু ঐ পুঁথিতে। একটা হল অদৃশ্য

হবার কৌশল। একটা মন্ত্র লিখে কবচে ঢুকিয়ে ধারণ করলেন এবং মড়ার খুলি ঘষে কয়েকটা মশলা সহযোগে কপালে তিলক কাটলেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনি অদৃশ্য। এবং অন্তরীক্ষে চলাচলের শক্তির অধিকারী। আমার কাছে মন্ত্রটা লেখা আছে, আপনাদের কারো আবশ্যক থাকে তো বলুন। অদৃশ্য হয়ে চৌরকর্ম না-ই করলেন, ট্রেনভাড়া প্লেনভাড়া ফাঁকি দিয়ে অবাধে যত্রতত্র ঘুরবেন—সে-ই বা মন্দ হল কিসে?

'দেশ' পত্রিকায় 'নিশিকুটুম্ব' ধারাবাহিক বেরুতে লাগল। কত বড় ঝুঁকি নিয়েছি, তখনই বুঝলাম। চোর সকলের ঘৃণ্য—দু-একটা কিস্তি বেরোতেই পাঠকমহলে হৈ-হৈ পড়ে গেল। সম্পাদকের নামে চিঠি আসছে: লেখা বন্ধ করে দাও। লেখকের নামে গালিগালাজ করে চিঠি আসে। গল্প যত এগিয়ে চলে, চিঠির সুর তত বদলায়। গল্পের নায়ক সাহেব-চোর—তারপরে দেখি, সেই চোরকে ভালবেসে ফেলেছেন পাঠকেরা। তার জন্য কত উদ্বেগ, বেদনা। লেখকের কাছে অনুরোধ আসে সাহেবের মা-বাপ খুঁজে দেবার জন্য, রাণীর সঙ্গে তার বিয়ে দেবার জন্য (এসব চিঠি বিশেষ করে পাঠিকাদের)। টের পাচ্ছি, লাইন ধরে ধরে পাঠকেরা পড়ছেন—সামান্য অসঙ্গতি হলেও রক্ষে নেই, ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠি চলে আসে। কেউ বা লিখছেন, লেখক নিশ্চয় চৌর-কর্মে বিশারদ—হাতেনাতে অভিজ্ঞতা, নয়তো এত খুঁটিনাটি কেমন করে জানলেন? এমনি চিঠি অনেকগুলো রেখে দিয়েছি, পড়ে কৌতুক বোধ করি।

এমন দুর্ধর্ষ চোর সাহেব—আচমকা তবু এক একটা পুণ্যকর্ম করে ফেলে। অনুতাপের অন্ত থাকে না তার জন্য, কালীর কাছে প্রার্থনা করে: আমায় মন্দ করে দাও মা-জননী—একেবারে নিখুঁত নির্ভেজাল মন্দ। কিন্তু কামনা কিছুতেই পূরণ হল না। গল্পের পরিণতিতে এসে সাহেব-চোর পরিপূর্ণ মানবিক মহিমায় ভাস্বর।

একেবারে হতাশ হয়ে সে ভাবছে : "মানুষ জাতটারই দোষ, চেষ্টা যতোই করো, মন্দ হবার যো নেই।...দেখে যাদের মন্দ ভেবেছি, আজকে মনে হচ্ছে ঢং দেখিয়ে তারা মন্দ সেজে বেড়ায়—দায়ের মুখে ভাল-মূর্তিটা বেড়িয়ে পড়বে। অমৃতের বেটাবেটি সব—ভাল না হয়ে উপায় আছে? মানুষ যতকাল আছে, জাতের স্বধর্ম বয়ে বেড়াতে হবে।"

আমার গল্পেরও এই শেষ কথা।

অন্ধ্র ও বঙ্গ

গোলকুণ্ডা অদূরে। পাহাড়ের উপর উদ্ধতশির দুর্গ, নিচে সারি সারি হীরক-বিপণি। সে হীরার সর্বত্র নামডাক। দুনিয়ার ধনী মানী প্রতাপান্বিতেরা গোলকুণ্ডার হীরক পেয়ে কৃতকৃতার্থ হন। সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন আরও দীপ্তিমতী অরলোভ হীরক-রাজদণ্ডে। বৃটিশ রাজমুকুটে কোহিনুরই মধ্যমণি। গোলকুণ্ডার হীরকখচিত ময়ূরাসনে বসে পারস্যের শাহের গর্বের অবধি নেই। আরও কত কত হীরা কত জনের ভাগ্যে জুটেছে, আকাশের তারার মতো তা গণনাতীত।

গোলকুণ্ডার ঐ প্রবেশপথে ছিল কারওয়ার-পল্লী—হীরা-কাটাই ও হীরা পালিশে তাদের জুড়ি নেই। দেশবিদেশের হীরক-সন্ধানীরা ঐখানে এসে জুটতেন। পর্যটক টাভার্নিয়ে সুদূর ফরাসিদেশ থেকে এসে ঐখানে কোন এক অখ্যাত সরাইখানায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আমিও একালের এক হীরক-সন্ধানী—বাংলা দেশ থেকে গোলকুণ্ডা অঞ্চলে এসে উঠেছি। ভাগ্যবান আমি, সরাইখানায়

অন্ধ্র সাহিত্য-অধিবেশনে (নিখিল-ভারত সাহিত্য-সম্মেলন, ১৯৬৭) উদ্বোধনী ভাষণ

উঠতে হয়নি—আপনাদের সদয় আতিথ্যে পরম আরামে আছি। ভূতাত্ত্বিকেরা নিরুত্তম করতে চান—গোলকুণ্ডার ভাণ্ডারে হীরা নাকি নিঃশেষিত। আমি কিন্তু সন্ধান পেয়েছি হীরার—তার ঔজ্জ্বল্যে কোহিনুর লজ্জা পেয়ে যায়। সে হীরা অন্ধ্রের মৃত্তিকাতলের নয়, অন্ধ্রের মানসলোকের। অন্ধ্রের শিল্প-সাহিত্য, ভাষা সংস্কৃতি। বিশ্বজন সম্মোহিত তার রূপবৈভবে।

অজন্তার গুহা-চিত্রাবলী এবং অমরাবতীর ভাস্কর্য ভুবনের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তিগুলির মধ্যে অন্যতম। অন্ধ্রের শিল্পীরাই তার স্রষ্টা। কর্ণাটি সঙ্গীত সর্বভারতের গর্বের ধন—তার আদি উৎস তেলুগু সঙ্গীতের মধ্যেও, অন্ধ্রেই তার উৎপত্তি। মহাতাপস সঙ্গীতসাধক ত্যাগরাজুর উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করি এই প্রসঙ্গে। তাঁরই জীবন-সাধনায় সঙ্গীতের চরমোৎকর্ষ ঘটেছে। সহস্রাধিক ভক্তি-সঙ্গীতের রচয়িতা তিনি—সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ইষ্টদেবতা রামচন্দ্রের স্তুতি।

ভাবগত-সংহতির জন্য আজ আমাদের ব্যাকুলতার অন্ত নেই। অন্ধ্রসাহিত্যের সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের আমরা উদ্বাহ ঘটাব—উভয় পক্ষের জ্ঞানী-গুণীরা নিমন্ত্রণ-সভা আলো করে বসেছেন। সুপ্রাচীন কাল থেকেই অন্ধ্রভূমি মিলন ও সংহতির ক্ষেত্র। উত্তরের আর্য সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে দক্ষিণের দ্রাবিড় সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যের মিলন হয়েছে এখানে। ভৌগোলিক অবস্থান ও ইতিহাস এই সঙ্গম-সাধনের সহায়ক। অন্ধ্রের উত্তরে ও পশ্চিমে আর্যাবর্তের মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র ; অন্ধ্রের দক্ষিণে দ্রাবিড়-সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি তামিলনাদ। আর্য-সংস্কৃতি ও দ্রাবিড়-সংস্কৃতি দু'দিক দিয়ে অন্ধ্রভূমিতে পৌঁছে আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে গেল।

কিন্তু মিলন সত্ত্বেও গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের মতোই চেহারার ভিন্নতা কতক পরিমাণে বজায় রয়েছে। তেলুগু ভাষা-সাহিত্যের মোটামুটি

দুই ভাগ—'মার্গ' ও 'দেশি'। মার্গে সংস্কৃতের প্রভাব, দেশির মধ্যে ভূমি-সংস্পর্শ পাওয়া যায়। অর্থাৎ তেলুগু ভাষা-সাহিত্য দ্রাবিড় সংস্কৃতির মাটিতে শিকড় বসিয়েছে, এবং সংস্কৃতের আলো-হাওয়া নিয়ে ডালে-পাতায় পরিপূর্ণতা পেয়েছে। ভাষারও সেইজন্য দুই নাম: দেশজ নাম 'তেলুগু', সংস্কৃতজ নাম 'অন্ধ্র'। ভারতে অন্য কোন ভাষার এমন দুই নামে পরিচিতি নেই।

তেলুগু ও অন্ধ্র মূলত দুই স্বতন্ত্র গোষ্ঠী। উত্তর অঞ্চল থেকে শাসক রূপে অন্ধ্রেরা এসেছিল, আর্যভাষা প্রাকৃতে তারা কথা বলত। তেলুগুভাষী তেলুগুরা দ্রাবিড়জাতির শাখা—নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকত, অন্ধ্রেরাই তাদের একত্র করে সমজাতীয়তার বন্ধনে বাঁধল। এবং নিজেরাও মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল তেলুগুদের সঙ্গে। বৈদিক ধর্ম ও হিন্দুত্ব সেই মিলনের সূত্র—বৈদিক ক্রিয়াকর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান জাতীয় জীবনের নিয়ামক। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ও প্রচয়—এই বৈদিক স্বরসূত্র নিখিল-ভারতের মধ্যে একমাত্র অন্ধ্রেই অবিকৃত রয়েছে।

কুমারিল ভট্ট, হাল, মল্লিনাথ প্রমুখ সংস্কৃত-সাহিত্য ও দর্শনের বহু দিক্‌পাল অন্ধ্রভূমিতে জন্মেছেন। ভবভূতির সাহিত্য-সাধনা কাশ্মীরে বটে, কিন্তু তেলেঙ্গানার পার্শ্ববর্তী বিদর্ভের মানুষ তিনি। বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন, আর্যদেব, দিঙনাগ অন্ধ্রেরই সন্তান। বৈদগ্ধ্যের ধারাবহতা সেকালের মতো আজও নিরবচ্ছিন্ন। মহামনীষী সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ্ এবং আহ্লাডি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার, বেনেগাল রমা রাও, এম. অনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার, বি. গোপাল রেড্ডি (প্রদেশ সাহিত্য-আকাদেমির সভাপতি) প্রভৃতির জন্মে একালের অন্ধ্র গৌরবোজ্জ্বল হয়েছে।

অন্ধ্রে নবযুগের স্রষ্টা মহাতেজা বীরেশলিঙ্গম্ পন্তলু। নবীন তেলুগু-সাহিত্যের জন্মদাতা তাঁকেই বলা যায়। গোল্ডস্মিথের অনুসরণে তেলুগু সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস তিনি লিখলেন। হেন

বিষয় নেই, যা নিয়ে তিনি লেখেন নি। উপন্যাস, ছোটগল্প, আত্মজীবনী, রঙ্গব্যঙ্গ, তেলুগু সাহিত্যের ইতিহাস এমন কি শিশুপাঠ্য জ্ঞানগর্ভ নীতি-উপাখ্যান পর্যন্ত। ব্রাহ্ম হলেন তিনি রামমোহন রায়ের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে; বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদি সমাজ-সংস্কারের সার্বিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চিরাচরিত কুসংস্কার এবং অবিচার-অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী খরধার অসি হয়ে উঠল। বীরেশলিঙ্গম্ সেই যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে গেলেন, তারপর থেকেই জীবনোল্লাসে তেলেগু সাহিত্যের নব নব পথে প্রধাবন।

প্রতিবেশী সাহিত্যের খোঁজখবর আমরা যথেষ্ট পরিমাণে রাখি নে, পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ অতিশয় সঙ্কীর্ণ। তা সত্ত্বেও নতুন কবিদের পদদাপ হায়দরাবাদ-সেকেন্দ্রাবাদ থেকে সুদূর কলকাতাতেও যৎকিঞ্চিৎ পৌঁছে গেছে। নামেও তাঁদের রীতিমত বৈচিত্র্য: দিগম্বর-কবি। বছর তিনেক আগে হায়দরাবাদে তাঁরা সভানুষ্ঠান করেছিলেন জনৈক রিক্সাওয়ালার নেতৃত্বে। চলতি নিয়মকানুন এবং ছন্দ মিল ইত্যাদি বর্জন করে কবিতার নিরলঙ্কার প্রকাশ এঁদের পরিকল্পনা। বিধিনিয়মের নিগড়ে আন্তর ঐশ্বর্য স্তিমিত হয়ে পড়ে—আবরণহীন উলঙ্গ ভাব কবিতায় এঁরা ধরে রাখতে চান।

আজকের গুণিসভায় আমি বঙ্গসাহিত্য ও অন্ধ্রসাহিত্যের উদ্বাহ-প্রস্তাব তুলেছি। ভাবতে আনন্দ লাগে, ঘটকালির কাজটা আমাদের পূর্বসূরীরা অনেকদূর এগিয়ে রেখেছেন। উনিশ শতক থেকেই বাংলা ও অন্ধ্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মিক সম্পর্ক। রামমোহন রায়ের সংস্কার-আন্দোলন অন্ধ্রকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করল, বুদ্ধিজীবীরা তাঁর পথানুসরণ করে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করলেন। বাংলাদেশের পরে অন্ধ্রেই বোধহয় ব্রাহ্মসমাজের বিস্তৃতি ও প্রভাব। কেশবচন্দ্র সেন ও বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শও ব্যাপক সমাদর

লাভ করল এখানে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র দত্ত অনুবাদের মধ্যবর্তিতায় অন্ধ্রে এসে আসন পরিগ্রহ করলেন। রবীন্দ্রনাথকে নিখিল-অন্ধ্র দু-বাহু বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছে ; শান্তিনিকেতনের একাধিক প্রাক্তন ছাত্র আজকের অন্ধ্রে নেতৃত্বের আসনে। আমাদের শরৎচন্দ্র তো এখানকার একেবারে ঘরের মানুষ—আবালবৃদ্ধ মুগ্ধ হয়ে তাঁর বই পড়েন। পণ্ডিচেরিতে প্রতিবেশিত্ব নেবার পর থেকে শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব সারা অন্ধ্রে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। সে আমলের নিজাম বাহাদুরের প্রবল প্রতাপান্বিত দেওয়ান স্যর আকবর হায়দরি পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের অনুরাগী ভক্ত।

অন্ধ্রের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে আমার যে সামান্য পরিচয়, বঙ্গ অন্ধ্র তারপরে আমি আর পৃথক ভাবতে পারি নে। দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডু বঙ্গ-কন্যা বটে, কিন্তু ধাত্রীমাতা অন্ধ্রের কোলে তিনি লালিতা। শ্রীমতী নাইডুর কীর্তিধর ভ্রাতৃযুগল বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কবি হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কেও ঠিক এই কথা খাটে। তেমনি আবার, অন্ধ্রভূমির বিশ্বনন্দিত সন্তান সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মভূমি নির্বাচন করে বাংলাদেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। পট্টি শ্রীরামুলুর জ্যোতির্ময় মূর্তির পাশে আমি বীর যতীন দাশকে দেখি—অন্যায়ের বিরুদ্ধতায় সর্বভারতে এই দু-জন প্রায়োপবেশনে প্রাণ দিলেন। সংগ্রামক্ষেত্রে বাঘা-যতীন আত্মদান করলেন—তাঁর চারি সঙ্গী ছাড়াও মানসচক্ষে আমি সীতারাম রাজুকে দেখতে পাই।

আবির্ভাব

সে আমলের এক বীর কিশোরের
কথা মনে পড়ল।
মুড়ি খাচ্ছিল আর ছাঁচ-বাতাসা,
সেই সঙ্গে হাসিমস্করা গল্পগুজব।
হঠাৎ একজনে এসে ফিসফিসিয়ে
কানে কানে কি বলে যায়।
মুড়ির বাটি ফেলে ছুটে বেরুল।
আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি :
কী ব্যাপার ?
না, এমন কিছুই নয়।
ফিরল ঘণ্টাখানেক পরে—
এসেই প্রথম কথা :
'কুত্তা একটা মেরে এলাম,
এমন কিছু নয়।
কই হে, আমার মুড়ির বাটি ?
বাতাসাগুলো মেরে দিয়েছ ?
আনো আবার। নয়তো রক্ষে রাখব না।'
আধেক-বলা সেই গল্পটা ধরল,
হো-হো করে উদ্দাম হাসি সঙ্গে।
পরের দিনের কাগজে হৈ-হৈ ব্যাপার—
স্বদেশদ্রোহী একটা খতম হয়েছে আবার।
'কী আশ্চর্য, হাতের রক্ত ধুয়ে
মুড়ির বাটি নিলে তক্ষুণি কেমন করে ?
হাসতে পারলে অমন
ছাত-ফাটানো হাসি ?'

চীনা সৈন্য হামলা দিয়ে পড়লে দেশব্যাপ্ত উন্মাদনা জেগেছিল, সেই সময়ের লেখা

সে বললে, 'মেরেছি হন্সে-কুকুর একটা—
ভাল ভাল মানুষজন কামড়ে বেড়াত,
হাসবই তো!
কাঁদুকগে ঘটা করে সরকার বাহাদুর
যাদের খয়ের-খাঁ নিপাত গেল।'

কয়েকটা বছর পরে—
ভরা-যৌবন তার। বসন্ত এসেছে,
আম্র-নিকুঞ্জে কোকিল ডাকে কুহু-কুহু।
এক রাত্রে হাসতে হাসতে
সেই বন্ধু গলায় পরল—
কোন সু-কন্যার কুসুমমাল্য নয়,
ফাঁসির রজ্জু।
'বন্দেমাতরম্' বলে ছুটে গিয়ে
রজ্জু গলায় তুলে নিল।
ফুলশয্যার রাতে প্রিয়ার হাতের মালা কেউ
অত আগ্রহে অমন আদর করে পরে না।
সেইদিন অপরাহ্ণে—
মা এসেছিলেন শেষ-দেখা দেখতে।
আমি জানি, মায়ের সাথে
ছিলাম যে আমি।
নিজের হাতে সে মায়ের
চোখ মুছিয়ে দিল :
'কান্না কিসের মা?
আমি তো আবার আসছি।
ফিরে আসব মুক্ত দেশের স্বাধীন নাগরিক।
আরও যাঁরা সব গেছেন, সবাই আসবেন।
সোনার দেশ ছেড়ে থাকতে পারি আমরা?
স্বর্গেও তো শান্তি পাবো না।'

তো, ক'বছরের কথা—
তিরিশটা বছর হয়তো বড় জোর।
সে ছবি আমার চোখের উপর জ্বল-জ্বল করে।
নিশ্বাস ফেলেছি কতদিন,
আবির্ভাবের পুণ্যক্ষণ কবে আসবে?
কবে? কবে? কবে?
তাঁরা তো মিথ্যা বলতেন না—
আমার জীবনকালে দেখতে পাব আবার?

আজকে হিমগিরি বিদারণ করে
বীভৎস করাল ড্রাগন
অতর্কিতে নখর হানল
নিঃশঙ্ক বিশ্বাসপর প্রতিবেশীর উপর।
জিহ্বায় হিংসার লকলকে আগুন,
দংষ্ট্রায় হলাহল।
মঠ-নগরীতে রক্তস্রোত বয়ে গেল,
পর্বতের কন্দরে কন্দরে নির্জিত
মানবাত্মার আর্তনাদ।
ওরা ভেবেছিল, তথাগতের দেশে
তখনো অহিংসা ও শান্তির মন্ত্রোচ্চারণ চলবে:
'ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি—'
এবং রামধুন আওড়াবে বিভ্রান্ত মানুষ।
বিমূঢ় অরাতি!
পিষ্ট ভুজঙ্গেরা ফণা তুলে গর্জে উঠেছে,
মাতৃযজ্ঞে সর্বস্ব আহুতির জন্য আকুলি-বিকুলি
হাতের মুঠোয় প্রাণ—
ইঙ্গিত মাত্র ছুঁড়ে দেবে
একের বদলি একশ' জনে হনন করে।
এজাত-ওজাত এভাষা-ওভাষা
তুচ্ছতার কলহ স্তব্ধ,

একজাতি একপ্রাণ সব মানুষের,
একটিমাত্র হৃদয়।
টেড়ি-ফোলানো লায়েলাপ্পা-গাওয়া
রোয়াকবাজ যে ছোঁড়াগুলোর জন্য
পাড়ার লোকের সোয়াস্তি ছিল না,
হঠাৎ দেখতে পাই
মলিন ছদ্মবেশ ঝেড়ে ফেলে
মহিমময় বীরমূর্তিতে তারা উঠে দাঁড়িয়েছে
শঙ্খধ্বনি করো মা-জননী,
আঙুল চিরে ওগো কন্যা, কপালে তাদের
রক্ত-টিকা পরাও।
সেইসব মুখের উপরে ছবি দেখা যাচ্ছে—
উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন ছবি,
আমার কিশোর-কালের সেই বান্ধবের,
প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের, কানাই-সত্যেনের,
আমাদের যতীন-দা, বাঘা-যতীনের—
কত আর নাম করব তাঁরা যে অগণন।
দেশের মুক্তিতে প্রাণ দিয়েছেন—
স্বাধীন দেশের জন্য আবার এ প্রাণদানের সৌভাগ্য
কেন ছাড়বেন ?
এসেছেন তাঁরা। সঙ্কটের দিনে নতুন আবির্ভাব।
শঙ্খ বাজাও মা জননী-
ভগিনী, জয়টিকা পরাও।
ধন্যবাদ তোমায় অরাতি
আমার জীবনকালের মধ্যে
বাল্য-কৈশোরের বীরবৃন্দকে
নতুন আবার চিনিয়ে দিলে।